

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫২
তৃতীয় মুদ্রণ—১৩৫৭
চতুর্থ মুদ্রণ—১৩৬০
পঞ্চম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৬৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬৫
সপ্তম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৬৭
অষ্টম মুদ্রণ—কার্তিক, ১৩৬৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

তোমাকে

এই লেখকের অন্যান্য বাংলা বই

রাজেশ্বরী
অর্ধেক মানবী তুমি
রোম থেকে রমনা
রাজসী
রক্তরাগ
প্রথম ধরেছে কলি
সেই চিরকাল
সুদূর বাঁশরী
পশ্চিমের জানলা
সেই কলকাতা
জীবনের চেয়ে বড়
প্রেম, আগ্রা স্টাইল

সূচীপত্র

নিবেদন

ইয়োরোপের যে চিত্র পাঠক এই বইয়ে পাবেন গত মহাযুদ্ধের পর তার পূর্ণ সার্থকতা আছে কি না এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু যে ইয়োরোপ লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং যাকে যুদ্ধবিরতির পর পুনর্গঠন করা সত্ত্বেও হয়তো ঠিক আগেকার রূপে সম্পূর্ণভাবে ফিরে পাওয়া যাবে না কেবল তারই চিত্র এখানে আঁকা হয় নি। আমার মত কল্পনাবিলাসীর যৌবনস্বপ্নের তীর্থ নানা কারণে ভগ্ন, ভূলুণ্ঠিত ও শান্তির সুখস্বর্গচ্যুত হয়ে যায়। তবুও তো মানুষ সেই অতীত ও শাশ্বতের চিত্র ও কাহিনীর ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ হলেও আন্তরিক পরিচয় বার বার পেতে চায়। সেই চাওয়ার মধ্যে যদি 'ইয়োরোপা'র কোন সার্থকতা থেকে থাকে তবেই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

তা ছাড়া চিরচঞ্চলের মধ্যে চিরন্তনের যে স্পর্শ ও বিকাশ আছে তার মাধুরী ও মহিমা ইয়োরোপের মত বহুমুখী জীবনীশক্তিসম্পন্ন দেশে সন্ধান করার প্রয়োজন আছে। সে সন্ধান যদি আমরা পাই তা হলে, বিশেষ করে এই যুগে, স্বাধীন ভারত ও ইয়োরোপ শুধু আনন্দের অন্নসত্র নয়, জ্ঞানের যজ্ঞসত্রেও সহজে ও সসম্মানে মিলিত হতে পারবে।

আসামের শ্যাম শৈলমালার ছায়ায় নির্জন তাঁবুতে বা দুর্গম গ্রামে বসে কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে এই প্রবন্ধগুলি লিখবার সময় বহু আদিম জাতির জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে স্মৃতির পটে আঁকা আধুনিক সভ্যজাতির চিত্রগুলির মধ্যে প্রায়ই ফিরে গিয়েছি। তাই ভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও সময়ের ব্যবধান প্রথম ভাবধারা ও অনুভূতিকে ব্যাহত করেছে বলে মনে করি না।

ইয়োরোপে আমি বিদেশে প্রবাস যাপন করছি বলে কখনো মনে করতে চাই নি। মানসলোকে বিহার করতে চেয়েছি। তার সঙ্গে যে স্মৃতি ও শ্রদ্ধা বিজড়িত আছে তার প্রকাশের বিফল প্রয়াস করতে চাই না। তা আমার ভারতকে নূতন আলোকে চিনে নিতে সহায়তা করেছে। সেজন্য আমি ইয়োরোপের কাছে কৃতজ্ঞ।

দেবেশ দাশ

শিমলা শৈল, আশ্বিন, ১৩৪৭

(প্রথম সংস্করণ)

পরিচয়

লেখকের সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হত তবে 'ইয়োরোপা' পড়ে মনে করতুম যে গ্রন্থকার বহুদিন সাহিত্যচর্চা করেছেন, আর বর্তমান বইখানি তাঁর পরিণত বয়সের পরিপক্ক রচনা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপে জানলুম যে এইটিই তাঁর প্রথম উদ্যম, এবং প্রবীণ হতে তাঁর এখনও বিস্তর দেরি আছে। অতএব অনুমান করছি—তিনি শুকদেবের মতন পূর্বসংস্কার নিয়ে জন্মেছেন, অথবা শিশুকাল থেকেই মনে মনে হাত পাকিয়েছেন।

'ইয়োরোপা'য় প্রথমেই নজরে পড়ে—ভাষার ঝরঝরে প্রকাশ-ভঙ্গী, যাতে কোনও রকম কৃত্রিমতা মুদ্রাদোষ বা উৎকট মৌলিকতার চেষ্টা নেই। এ ভাষা খাঁটি বাংলা, ইংরেজী ইডিয়মের ভেজালে জাত হারায় নি। অথচ এতে অসাধারণ লক্ষণ সুস্পষ্ট। লেখক আবশ্যক স্থলে নূতন শব্দ গঠন করেছেন, নূতন ভাবে বাক্য-বিন্যাস করেছেন, কিন্তু সে-সমস্তই বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে অবিরোধে খাপ খেয়ে গেছে।

বইখানি মামুলী ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। ইয়োরোপের গীর্জা মঠ দুর্গ সেতু প্রাসাদ চিত্রশালাদির বর্ণনা এর মুখ্য বিষয় নয়। ইয়োরোপ কত উঁচুতে আর আমরা কত নীচে পড়ে আছি এ রকম বিলাপও এতে নেই। লেখক প্রতিদিন কি করেছেন, কেদার-বদরী-যাত্রীর মতন কোন্ কোন্ চটিতে বিশ্রাম করেছেন আর কতবার খিচুড়ি খেয়েছেন—এ রকম বিশ্বস্ত খবরও এতে নেই। লেখকের কৃতিত্ব এই—তিনি ইয়োরোপের যে বৈচিত্র্য দেখে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন তার রস লেখার প্রভাবে পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। ইয়োরোপীয় প্রকৃতির যে রূপ লেখক বাহ্য ও অন্তরদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ

করেছেন তা শুধু নিসর্গশোভা নয়, ঐতিহ্য মানবপ্রকৃতি জাতীয় সাধনা সবই তার অন্তর্ভুক্ত। তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেনের মতন তিনি পাঠকের টিকি ধরে বিশ দিনে বিলাত ঘুরিয়ে আনেন নি। এই পুস্তকে যে চিত্রপরম্পরা দেখতে পাই তা সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত, কিন্তু জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ইয়োরোপ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু 'ইয়োরোপা' পড়ে মনে হয়েছে মনশ্চক্ষুতে তা দেখছি।

রাজশেখর বসু

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার ইয়ুরোপের পত্রে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি তার প্রধান কারণ আমাদের দেশের অনেক লেখকের মতো তুমি য়ুরোপকে খর্ব করবার চেষ্টা করনি। তুমি তার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছ, — দৃষ্টিকে প্রসন্ন না রাখতে পারলে কোনো সুমহৎ নূতন লোককে সত্য করে দেখতে পাওয়া যায় না। তুমি আনন্দিত মনে য়ুরোপকে দেখেছ এবং সেই আনন্দ পাঠকদের বিতরণ করেছ। আমার দুর্বল লেখনী অধিক লিখতে অক্ষম। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

মরিতে চাহি না আমি

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। সকাল থেকে বসে বসে এই কথাটি ভাবছি। একটি পুরানো চিঠি সামনে খোলা পড়ে রয়েছে আর একটি চিত্র চোখের সামনে ভাসছে। পাঁচ বছর আগে লেখা একটি বন্ধুর চিঠি। সৈন্যদলে যোগ দেবার আগের রাত্রিতে লেখা চিঠি। আসন্ন বিরহে বিহ্বল, বাঁচবার বাসনায় ব্যাকুল নববিবাহিতের চিঠি। তার স্ত্রীর দেশ জার্মানরা দখল করেছে। নিজের দেশ চারিদিকে মুখরিত জলপ্লাবনের মধ্যে শেষ গাছটির মত দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে কাল ভোরেই সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে। সে লিখছে "আমার চারিদিকে পৃথিবী ভেঙে পড়ছে, প্রলয়ের জলকল্লোল কানে এসে বাজছে, নব পরিণীতাকে পিছনে একা ফেলে রেখে যাওয়া অনন্ত দুঃখের। তবুও তোমার দেশের যে কবির বাণী তুমি আমায় প্রায়ই বলতে সেটি আমি আমার এই শেষ চিঠিতে তোমায় শুনিয়ে যাচ্ছি—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।"

পাঁচ বছর আগেকার নীরব মরণের নিমন্ত্রণ আজ সকালে আমার কাছে নিবিড় জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে তুলছে। মরিতে চাহি না আমি।

তবুও তো এই ছয় বছরে কত মৃত্যুর ও মৃত্যুর চেয়ে বড় ধ্বংসের খেলা ইয়োরোপে অভিনীত হয়েছে। এবং কত ব্যাপক ও গভীরভাবে হয়েছে তার পরিমাণ এখনো কেউ জানে না। আমার যুদ্ধের আগের ইয়োরোপা আজ সুদূর অতীতের অলীক সুখস্বপ্নের মত কোথায় হাতছানি দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। স্মৃতির পটে দাগ মিলাতে মিলাতে যুদ্ধক্ষেত্রে, বিপর্যস্ত শহরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বিচ্ছেদক্লিষ্টের অন্বেষী মন নিয়ে।

কিন্তু কোথায় সে ইয়োরোপা? তার মোহন মাধুরী অনন্ত জীবন অন্তরলোকে নূতন আলোকপাত করেছিল। তার দেওয়া কল্পনামালা ও আনন্দের ডালা রণক্ষেত্রের শত ধোঁয়া আর কুয়াশা সত্ত্বেও অমলিন থাকবে তার ছোট ছোট ছবি, তুচ্ছ খেয়ালের খেলা, অকারণ আনন্দ ও বিফল বেদনার মুহূর্তগুলি স্মৃতির আনাচে কানাচে অনন্ত রূপ ধরে বার বার জেগে উঠছে। মিলিয়ে দিতে কি পারবে তাদের এই বিস্মরণের সুদূর প্রভাতের মায়ায় আজকের ধ্বংস-উৎসব, মানবাত্মার

অনভিপ্রেত এই সর্বনাশা মৃত্যু-অভিযান ? বিভ্রস্ত বসুন্ধরার মধ্যেই আমি খুঁজে পাব সে ইয়োরোপাকে।

চিরচঞ্চলের মধ্যে নিত্যকালের যে আভাস ইয়োরোপ দেখিয়েছে তা হচ্ছে মানবের অনুভব, সুখদুঃখ ভালবাসার বিচিত্র বিকাশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধবিগ্রহ বিপ্লবের বস্তুতন্ত্রের মধ্যেও ইয়োরোপ মানুষের কথা ভুলতে পারেনি। তাই দশ বৎসর আগেকার পুরানো ছবিগুলিরও শাশ্বতরূপ বার বার দেখতে পাচ্ছি খুব নিকটে।

একটি ঐতিহাসিক দুর্গের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে আসার পর ন্যুরেমবার্গের অপরিচিত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। যে ঘরে কয়েদীদের উপর মধ্য-যুগের প্রথায় অত্যাচার করা হত ঠিক তার পাশের ঘরে অতীতের কোন রাজ-কুমারীর চম্পকাঙ্গুলির আলাপে অভ্যস্ত বিচিত্রবীণা একটি রাখা ছিল। তাতে একবার লুকিয়ে রূঢ় আঙুলের আঘাতে সুর-গুঞ্জন তুলবার চেষ্টা করেছিলাম এবং কয়েকজন দর্শক তা শুনে কৌতূহলী হয়ে ছুটে এসেছিল।

সে কথা ভেবে বিদেশীজনোচিত গাম্ভীর্যের মুখোশের উপরও মুখে হাসি অসম্ভবভাবে জেগে উঠছে। তা বুঝি বুঝতে পারছি আর সেজন্য বিব্রত বোধ করতে করতে চলেছি।

এমন সময় পিছন থেকে কে ডেকে আমায় এই মানসিক বিপদ থেকে উদ্ধার করল। একটি বিস্কুটীথণ্ডের লোক অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের বাহিরের স্কট ছাত্র স্মিত হাস্যে আমায় ডাক দিল।

সে ভেবেছিল যে কোন বিশেষ কারণে আমি কৌতুক অনুভব করছি এবং যদিও আমি অপরিচিত, এই বিদেশে আমিই তার কাছে পরিচিত, কারণ ইংরেজীতে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলাপ করতে পারব। আর আমি যদি অপরি-চয়ের ব্যবধান পার হয়ে তার ডাকে সাড়া দিই তা হলে সে আমার মজায় ভাগ বসাতে উৎসুক।

এমন লোকের সঙ্গে ভাব না করে উপায় কি ? তা ছাড়া জার্মান জীবনের মধ্যে ঢুকবার ভাল চাবিকাঠি নিশ্চয়ই এর কাছে আছে। যে এমনভাবে বিদেশীয়-তার বর্ম ভেদ করে এগিয়ে এসেছে সে নিশ্চয়ই এদেরও মধ্যে মিশে গেছে। এবং হয়তো এরও মনের মধ্যে ঘুরছে সেই কবিতাটি

'কত অজানারে জানাইলে তুমি'

রাত্রে আমরা দুজনে মাটির নীচে লুকানো একটি সপ্তদশ শতাব্দীর পুরানো 'সেলারে' খেতে গেলাম। সে যুগের ব্যবহৃত পাত্রে সে যুগেরই প্রচলিত পানীয় আছে। দুজনের বাহুর ভিতর দিয়ে দুজনের বাহু বাঁধা রেখে তা পান করতে হয়।

কারণ খুব সামান্যই বলতে পারা যায়, অথবা বিশেষ অসামান্যও বটে। যে গানটি সবাই মিলে বাজনার তালে তালে ঐকতানে গাইছে তার অর্থ হচ্ছে—রাইন নদীর জলধারা সুন্দর, কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর হচ্ছে সেই রাইন-কন্যা যার নয়নে সে জল প্রতিবিম্ব ফেলে, যার সোনালী কেশরাশি রাইনধারার মত কাঁধের উপর লীলাভরে ছড়িয়ে পড়ে; অতএব তোমরা সবাই 'স্পার্কলিং রাইন' পান কর।

এমন গান, এমন উল্লাস ও পানীয় বিনিময়ের এমন মধুর প্রথা দেখে দেখে আশা মেটে না! রাইনের নামে সবাই বিহ্বল, গানে ও বাজনায় সবাই মুগ্ধ, কিন্তু বার্নসের দেশের বন্ধুটির মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে যদিও সে খুব আনন্দ পাচ্ছে তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা কোথায় যেন খচখচ করে বিঁধছে।

সে কি কারো প্রীতির স্মৃতি? সে কি কারো বিস্মৃত প্রীতি? না সে কি স্মরণে বিস্মরণে আলো আঁধারে জড়ানো আনন্দবেদনার অব্যক্ত অব্যক্ত অনুভব-রাশি?

কি তার গানের উচ্চারণের মধ্যে রূপ পাচ্ছে? মনে পড়ল বার্নসের কবিতা—

"My heart is sair
I dare na' tell."

থাকুক না হয় তার মনে বেদনা। এই বিহ্বল রজনীর আনন্দ-চঞ্চলতা স্রোতের মত সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

দেশী-বিদেশীর কোন প্রভেদ নেই। এ তো শুধু ভোজনশালা নয়, এ হচ্ছে চিত্তবিশ্রামের আশ্রম। গানে আর পানে সবারই 'পরান হল অরুণ-বরণী'।

কে বলে ভাঙা কাঁচ ও ভাঙা হৃদয় জোড়া দেওয়া যায় না? ইয়োরোপের নূতন দাবি, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনকে বহুভাবে নেবার দার্শনিকতা ভাঙার উপর বেদনার উপর অহরহ প্রলেপ দিচ্ছে। তারই রাসায়নিক প্রক্রিয়া একদিন মনকে গতিশীল ও দুঃখকে সহনীয় করে নেবে।

এমনি করেই শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, দেশ-বিশেষ নয়, সমস্ত ইয়োরোপ বার বার বিপর্যস্ত ও যুদ্ধত্রস্ত হলেও গীতচ্ছন্দে আনন্দঝঙ্কারে প্রাণের উল্লাসে জেগে উঠবে। আজকের বোমারু-বিমান-নিপীড়িত আকাশের মোহন নীলিমায় লঘুপক্ষ পাখির মত বিহার করবে মানুষ। ভগ্ন লুণ্ঠিত পুরাতনের জায়গায় তৈরী হবে নূতন পরিকল্পনায় গ্রাম ও শহর। ধ্বংসের মরুর উপর বপন করে নেবে নবশ্যাম তৃণদল।

যুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, কি হয়েছে সেই জার্মান-ফরাসী নবদম্পতিটির যারা রাইনের বুকে আমার সঙ্গে এক জাহাজে জলবিহারে যোগ দিয়েছিল? সেদিনও এমনি ঘনঘটা জার্মানীর ভাগ্যাকাশকে মলিন করে তুলেছিল, আশঙ্কা-সংশয়ে দোদুল্যমান ছিল 'সা-র'-বাসী এই দম্পতির মত। বরটি আমায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি মনে হয় খুব শিগগিরই যুদ্ধ বাধবে?"

জার্মান বর ও ফরাসী বধূ।

যুদ্ধ যদি বাধে হৃদয় ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সে কথা মনে হল। তারা জানত না যে তাদের আগেকার কথাবার্তার অনেকখানিই দ্রুতগামী স্টীমারের বাতাসে ভেসে আমার কানে এসে পৌছিয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম যে শুনতে নেই এদের নিভৃত আলাপন; কিন্তু আমার অবস্থা তখন সেই কালিদাসের বর্ণিত ন যযৌ ন তস্থৌ।

সরে যদি যাই এরা বুঝতে পারবে কেন সরে গেলাম। কে জানে তাতে হয়তো এই ক্রৌঞ্চমিথুনের আলাপের যতিভঙ্গ হবে আর ওদের অভিশাপে আমার ইহজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা হবে না? আর যদি বিদেশী বলে কিছুই দেখছি না শুনছি না বুঝছি না এই ভান করে জাহাজের রেলিংএ ভর দিয়ে রাইনের শোভা দেখতে থাকি তা হলে শুধু এদের মধুচন্দ্র যাপনের যতি বা ছন্দ কেন, মানবশাস্ত্রের কোন ব্যাকরণই ভঙ্গ হবে না। একটুখানি ছলনা অবশ্য হবে। তা এদের সুবিধার জন্য না হয় নিজে একটু পাপই করলাম!

বধূ। শোন, যে কথাটা আজ এতক্ষণ মনের মধ্যে ভারী হয়ে আছে। আজকের 'টাগেব্লাটে'র খবরটি তো ভাল নয়। কি হবে বল তো?

বর। কিছুই হবে না। আজ আমরা হনিমুনে চলেছি। আজ কিছুই হবে না।

বধূ। আজ তো কিছুই হবে না। কিন্তু পরে তো হতে পারে?

বর। জানি না। যদি বা কিছু হয় আমরা দুজনে তো এমনি থাকব। আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

বধূ। কিন্তু পারবে কি তুমি আমায় তোমার কাছে রাখতে? তোমার তো তোমার দেশ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

বর। না, না, তা হতে পারে না। তুমি তো এখন আর ফরাসী নও, তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

বধূ। যুদ্ধ হলে তো তাতেও হবে না। বিদেশী স্ত্রীদের তো গতবার আটক করে রেখেছিল।

বর। না, না, আজ ও কথা ভেবো না।

বধূ। তুমি যে কি বল। আমি কি ও কথা ভাবছি? তোমার কাছে আছি, আমার ভাববার সময় কোথায়?

বর। ঠিক তাই; আমাদের এ সব ভাববার সময় নেই।

খানিকক্ষণ সব নীরব। শুধু রাইনের ছোট ছোট ঢেউ দুটি উন্মুখ উদ্বেল হৃদয়ের ছবি হয়ে স্টীমারের পিছনটিকে আঘাত করে করে চলে যাচ্ছে। তাদের চিন্তা আমাকেও দোলা দিয়ে যাচ্ছে আর দুধারের গিরিদুর্গগুলি ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসে শত শত আশানাশ ও হৃদয়ভঙ্গের মুক সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে নবদম্পতির রূপান্তর হয়ে গেল।

বর। শুনছ, বড় ভাবনা হচ্ছে। কিন্তু যদিই বা যুদ্ধ বাধে তার জন্য ভাবনা করে কি হবে? তার আগের দিনগুলিই অনন্ত কাল। সেই অনন্ত কালের আস্বাদ আজ পাচ্ছি। একটুখানি কাছে এস।

বধূ। তুমি ভাবছ কেন? কিছুই হবে না। আমিই মিছিমিছি খবরটার কথা তুলে দিনটা মাটি করে দিলাম।

বর। না, না, তুমি ঠিকই বলেছ। এসব কথাই আমাদের ভাবা দরকার। তবেই তো আমাদের দেশের জনমত যুদ্ধের বিরুদ্ধে তৈরী করতে পারব।

বধূ। যুদ্ধ, যুদ্ধ আর খালি যুদ্ধ। ছেলেবেলায় দেখলাম, আবার এখন হয়তো দেখতে হবে।

বর। কে জানে, আমাদের ছেলেদেরও হয়তো দেখতে হবে।

বধূ। না, তা হতে দেব না। আমাদের ছেলেদের কামানের রসদ হতে

দেব না। আজকাল সব মেয়েরাই এ কথা বলছে। ভবিষ্যতে শান্তি অটুট রাখবে মেয়েরাই। তুমি দেখে নিয়ো।

ভবিষ্যতের এই আশ্বাসে যে বর বর্তমানে বিশ্বাস করল তা মনে হল না। শুধু মেয়েটি আদর্শের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে জলরাশির উপর ফেনার মালার মত ঝলমল করতে লাগল। আর বরটি এতক্ষণে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জেগে উঠে একটু সরে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধবে?"

সেই নবদম্পতির যুগল-স্বাক্ষর করা উপহার রাইন তীরের ছবিটি আমার কাছে এখনো আছে। নেই হয়তো তাদের আশঙ্কার উপর ক্ষণজয়ী শান্তির নীড়টি। নেই হয়তো তাদের বিবাহের বা মিলনের বন্ধন। রাষ্ট্রতন্ত্র হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলির উপর ছড়িয়ে দেয় তন্দ্রা, রাজনীতি করে প্রীতিকে নির্মমভাবে নিপীড়ন। মানুষ যেন জন্ম থেকে তাদের জন্যই উৎসর্গীকৃত।

তবু তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। রাজ্য ও রাজনীতির ভাঙাগড়া উপেক্ষা করে জাগে মানবাত্মা নূতন মিলন-বন্ধনে নবীন যাত্রাপথের পথিক হয়ে। তাই ইয়োরোপে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর দুঃখ ও হিংসার উপর জয়ী হয়ে নব-নব যুগল স্বাক্ষর পড়ে যায় হৃদয়ের নিবিড় নিঃসীম প্রতিলিপিতে। ইয়োরোপ তো মরতে চায় না।

আরো একটি চিত্র এগিয়ে আসছে আজকের এই স্বপ্নময় আশ্বিনের শারদ আশ্বাসের আবরণ ভেদ করে। পুরানো বইয়ের দোকান সর্বদা আমাকে আকর্ষণ করে আর কল্পনাকে নাড়া দিয়ে যায়। খালি মনে হয় পুরানো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হয়তো একদিন এমন একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে এসে পড়বে যা আমায় বিখ্যাত, হয়তো বা অমর, করে দেবে।

ছাত্রাবস্থায় ভাবতাম বহু ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই মূলে রয়েছে আকস্মিক ঘটনা। কে জানে আমিও হয়তো অজ্ঞাতে পুরানো পুঁথির পথে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলব। বলা যায় না, ওই ন্যুব্জদেহ কুব্জপৃষ্ঠ দোকানদারের আলমারিগুলিতে যে পুরাতন জ্ঞানভাণ্ডার ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে কোন বই থেকে হয়তো একটা গোলাপের শুকনো পাপড়ি অতীতের কোন মিশর রাজকুমারী বা গ্রীক মহিলা কবির স্মৃতি-সুরভিত ইতিহাসই বা বহন করে আনবে। অথবা হয়তো কোন গুপ্তচরের গোপন সংকেত-চিত্র।

সেটি আজই সন্ধ্যাবেলায় কোন নির্দিষ্ট অথচ অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু তার বদলে আমার কাছেই সহসা প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই পুরানো বইয়ের দোকান দেখলেই আমি তার ভিতরে যাই।

জ্ঞানের আলো বা ভিতরের অন্ধকার দুই-ই আমার মনকে জাগিয়ে দেয়। সে জন্যই প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে এমন একটি দোকানে গেলাম যার এক কোণে মাটির নীচে একটি কফিখানাও আছে। সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন্ বিরাট গোপন তথ্যের প্রান্তে না জেনে পদক্ষেপ করেছিলাম তা কি তখন নিজেই জানতাম?

সেই একান্ত নিভৃত কোণে বসে বিজ্ঞানচর্চায় রত কয়েকজন ছাত্র আণবিক শক্তিকে বিস্ফোরণ বা আলোড়ন করা যায় কি না সে তথ্যের চেষ্টার পর চেষ্টার কথা আলাপ করছিল। তারা ভাবছিল যে এর মধ্যে সৃষ্টির যে আদিম শক্তি লুকানো আছে তাকে যদি মুক্তি দিতে পারে তা হলে সংসারে অসাধ্য সাধন করা যাবে।

সেই লোকগুলি আজ কোথায় গেল? তারা কি শুধু জ্ঞানপিপাসায় বা যুদ্ধোন্মুখ রাষ্ট্রের স্বার্থে এই অনুসন্ধান করছিল অথবা তাদের বিজ্ঞান অনুসন্ধানের উপর শত্রুর গুপ্তচর সন্ধানী নয়ন রেখেছিল? কিংবা তারা কি জীবকল্যাণের যে রহস্যে নিয়োজিত ছিল তা উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছিল অথবা মঙ্গলের পথচ্যুত হয়ে মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর আণবিক বোমা আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল?

আজ সমস্ত পৃথিবী বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করছে, জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এ কী মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করলে, হে পাশ্চাত্ত্য বস্তু-বৈজ্ঞানিকের দল? সংহতির বদলে এ কী সংহারের পথ খুলে দিলে, হে প্রতীচী, যার ফলে একটি বোমার আচমকা আলোয় বিশ্বের চোখে বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ হয়ে গেল, প্রলয়ের ঘোর রব আমাদের কানকে জ্ঞানের বাণীর প্রতি বধির করে দিল?

এই যদি শেষ ফল হয় তবে কি হবে এই শ্যামল সুন্দর ধরণীকে নিয়ে? তার প্রেমরসে ভরা ফলে ফুলে বিকশিত জীবনের বিহার-ক্ষেত্র প্রিয়গৃহ ও প্রিয়জন নিয়ে? এ সব কি আমরা সৃষ্টি করেছি শুধু সংহার করবার জন্য? এত কাব্য গাথা, চিত্রভাস্কর্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, এত হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির উদ্ভব ও অনুভব, এত কার্যকরী বিদ্যার আবিষ্কার ও প্রসার—এসব, সব কি শুধু যে অণুতে মানবের

জন্য সেই অণুতে শুধু তাকে নয়, তার সঙ্গে যুগযুগান্তের সঞ্চিত সৃষ্টি ও সভ্যতাকেও নিমেষে ও নির্মমভাবে ফিরিয়ে দেবার জন্য ?

কবি বলেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষ এক একটি খণ্ডদ্বীপ, তাদের ঘিরে রয়েছে বিরহের লবণ সমুদ্র। আমরা সভ্যতা সৃষ্টি করেছি সেই ব্যবধানকে লোপ করবার জন্য। জাহাজ ও বিমান হয়েছে দূরত্বকে কমিয়ে ভাই ভাই একঠাঁই করবার জন্য। আর এখন কি জাহাজ আসবে সমুদ্রপথে শুধু শত্রুবাহিনী বহন করে আনবার জন্য ? আকাশপথে আসবে মারণ পক্ষী ? শতাব্দীর পর শতাব্দী জ্ঞানান্বেষণের ফল কি এই হল ? তাতো হতে পারে না। তাই আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়েরই জনমত উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে যাতে পৃথিবী মানবেরই থাকে, দানবের হাতে বিকিয়ে না যায়।

মানুষের মধ্যে যে প্রাণ ও প্রতিভা আছে তা-ই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। প্রাণ দেয় তার সৃষ্টি আর প্রতিভা করে তার প্রতিষ্ঠা। আমার প্রবাসযাত্রায় এই দুইয়ের লীলা ও মাধুরী দেখেছি ও 'ইয়োরোপা'য় তারই প্রকাশের প্রয়াস করেছি। কিন্তু পৃথিবী ত্রিস্রোতা। তাই পাশাপাশি চলেছে সংহারের লীলা যা সংসারে আমরা কেউ চাই না, অথচ এড়াতেও পারি না। তবু এত শতাব্দীর সাধনার পর প্রলয়ই কি সৃষ্টি ও স্থিতির উপর জয়ী হয়ে উঠবে ?

এ কথা পৃথিবীর কেউ মানতে রাজী হবে না। অথচ এতদূর এগিয়ে এসে আজ আর ফিরবার পথ নেই। আমরা এখন ইচ্ছা করলেও মহাভারতের মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের মত অস্ত্রশস্ত্র সাগরগর্ভে উৎসর্গ করে মহাপ্রস্থান করতে চেষ্টা করব না। কিন্তু সংহারের পথে আরো কত দূর, আরো কত দূর, আমরা এমনি করে এগিয়ে যাব ?

পশ্চিম তাই স্বার্থ সত্ত্বেও জাগ্রত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ইয়োরোপে প্রশ্ন উঠেছে যে মানবের শিবসাধনায় যা উৎসর্গ হবার কথা ছিল, পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করবার জন্য সে বিদ্যাকে কেন নিয়োগ করা হল।

অণু বিস্ফোরণের মধ্যে ইয়োরোপ চেয়েছিল শিব; চোখ চেয়ে দেখতে পেল চারিদিকে রাশি রাশি শব। তাই সে বলছে, শুধু শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়াতে শান্তি স্থাপিত হয়নি; মানবাত্মাকে নিজের উপর বিজয়ী হতে হবে। এই চেষ্টা সার্থক হোক। এই চেষ্টাতেই প্রাচী শতাব্দীর পর শতাব্দী রত ছিল।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্
তেনাহং কিং কুর্যাম্।

সেই অমৃতের অন্বেষণ শেষ হয়নি যে এখনো। চারিদিকে যখন ধ্বংস ও অশান্তির লীলা চলেছে তখন প্রাচীর প্রাচীন সাধনা ও প্রতীচীর নবীন সন্ধান শান্তি ও কল্যাণের পথ আবিষ্কার করুক। এ দুইয়ের কেউই অপরকে ছেড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। পরমাত্মার জ্ঞান ও পরমাণু বিজ্ঞান দুই-ই সভ্যতার পরমায়ুর জন্য প্রয়োজন। তা যদি পাই তবেই আমরা পাব মৃত্যুঞ্জয় জীবন।

নয়া দিল্লী
আশ্বিন, ১৩৫২

ইয়োরোপা

নিরুদ্দেশ যাত্রা

১

মনের মধ্যে সুদূরের জন্য দোলা লাগিয়ে ইংলণ্ডের অপরূপ ঋতু-উৎসব পরীক্ষার্থীর জানালার সামনে দিয়ে শোভাযাত্রার মত মাসের পর মাস চলে গিয়েছে। প্রথম বসন্তস্পর্শের ভীরু উল্লাসের মধ্যে ফিরতে চেয়েছি। গাছে গাছে ফুলের আভাস, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূচনা খুঁজে পাবার জন্য, সোয়ালো পাখির ফিরে আসার জন্য, সী-গালের জল-কেলির জন্য, আমার জানালার সামনে বার্চগাছের পাতায় পাতায় রঙ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকবার্ডের আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি। ভোরের স্কাইলার্কের আহ্বানটি শুনতে একদিনও ভুল হয়নি; স্নোড্রপ ও ক্রোকাসের সহসা বিকাশের সন্ধান বাদ দিতে একদিনও ইচ্ছা হয়নি।

আজ ছুটি, ছুটি! মনে মনে যে বসন্ত ব্যাকুলতা এতদিন অনুভব করেছি তা আজ ছাড়া পাবে। কাজের বাধা যেন দূর হয়ে গেল—তা সে যেমন করেই যাক না কেন। একটা ঝড়ে উড়ে যাক বা বৃষ্টিতে ধুয়ে যাক—আর আমি অনির্দিষ্ট পথে বের হয়ে যাই।

আজ থেকে আমার ছুটি কাটাব কেমন করে? দুপাশের লতাগুল্মের 'হেজে'র বেড়ার পাশ দিয়ে ছায়াঘনিবিড় গ্রামপথে হাঁটতে হাঁটতে কখন মৃদু-কম্পিত ভায়োলেটের শেষ স্পর্শটুকু পাওয়া যাবে, কখন বা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর দিনগুলির উত্তাপে লাইলাক আর ল্যাবার্নাম্ বিকশিত হয়ে উঠবে, সেই খবর নিতে নিতে কোথায় আজ যাত্রা করব? সারের নিভৃত নিদ্রামগ্ন নাইটিঙ্গেল-মুখরিত নদীতীরে? 'সাসেক্সে'র সানুদেশের স্নিগ্ধ হরিৎ প্রান্তরে?

এই দেশকে একদিনের জন্যও নূতন বা অপরিচিত মনে হল না। আমার বহুদিনের কল্পনার শ্যামল গ্রামটি—টমাস হার্ডির গ্রাম, চেরিম্যাপ্‌ল-পপ্‌লারে সুন্দর লীলাচঞ্চল হাস্যময় মে-উৎসবের গ্রামটির চিত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের গ্রামগুলি যেন মিশে রয়েছে। সাহিত্যের পাতায় এই ইংলণ্ডের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, যেখানে রৌদ্রের দীপ্তি আছে—দাহ নেই, প্রকৃতির উল্লাস আছে—উন্মত্ততা নেই,

যেখানে কৃষকবালকের মত গর্সের সৌরভে আমোদিত প্রান্তরে গাছের ছায়ায় শুয়ে সুমধুর আলস্যে গুনগুন করে গান করা যাবে :

Lying in the hay all day

I feel as lazy as the hazy summer day—

যেখানে শীতের শেষে বসন্তের চুম্বন-পুলকে প্রকৃতি যখন পরিণত শোভায় মধুর হয়ে উঠেছে, সেই সময় চার্লস ল্যাম্বের মত দিনের প্রসন্ন আলোকের উত্তাপে অনুভব করব—**I feel ripening with the orangery.**

শরৎকালের বাঁধনকাটা মন লণ্ডনে আর পড়ে থাকতে চাইল না। এই সময়েই প্রাচীন ভারতের রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হতেন। আমার মনও ইয়োরোপের সব দেশে তার রাশ ছেড়ে দিয়ে ছুটতে চাইল।

চঞ্চল হয়ে উঠলাম। যেখানে খুশি চলে যাব—যত দূরে খুশি যাব—যেখানে আমার এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকবে না, চেনা লোক থাকবে না, আর থাকবে না ইয়োরোপীয় সতর্ক সময়নিষ্ঠা ও সুকঠিন আচারশীলতা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা "ইয়ুথ হোস্টেল অ্যাসোসিয়েশনে'র আমরা তিনজন প্রথম ভারতীয় সভ্য পিঠে-বাঁধা 'রুকস্যাকে' বোঝাই জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে এডিনবরার অতুলনীয় রাজপথ প্রিন্সেস স্ট্রীট বেয়ে উঠতে লাগলাম। লণ্ডন থেকে মাত্র ক'ঘণ্টার পাড়ি, তা ছাড়া এত বড় শহর। তবু প্রিন্সেস স্ট্রীট থেকে এডিনবরার গিরিদুর্গ দেখে মনে হতে লাগল যেন এরি মধ্যে আমার অরণ্যবাস আরম্ভ হয়ে গেছে। জনারণ্যের মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্গ—এই বৈচিত্র্যের আরম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে, এই শহরের উপকণ্ঠেই রানী মেরীর হলিরুড প্রাসাদ। ভাবতেই মন কি রকম চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এডিনবরায় আড্ডা নিয়ে ইংলণ্ড স্কটলণ্ডের সীমান্তদেশে কিছু ঘোরা গেল। এই সীমান্তকে স্কটের দেশ বলতে পারা যায়; কারণ স্কটের লেখনীই এই জায়গাকে এত বিচিত্র, রোমাঞ্চকর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। স্কটের বর্ণনায় যে যে দেশ পাই, যে দৃশ্য পাই তা এখনো অটুট আছে; শুধু নেই সে অদ্ভুত যুগের লোকগুলি। মেলরোজ অ্যাবির ভগ্নস্তূপ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। 'শেষ চারণের গানে' জ্যোৎস্নায় একে যেমন সুন্দর দেখাত বলে বর্ণনা আছে, তেমনি সুন্দর ম্লান মহিমায় এই ভগ্নস্তূপ এখনো আছে। কিন্তু মায়াবী

মাইকেল স্কটকে আর পাওয়া যাবে না। চেভিয়ট হিল্‌সের নদীগুলি বর্ষায় এখনো 'চেস্টনাট' রঙএর ফেনায় আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু তার মধ্যে কোন জাদুকরের মন্ত্র মেশানো নেই। ট্রসাক্‌স্ হ্রদের শান্ত সৌন্দর্যের মধ্য থেকে হঠাৎ অলৌকিক সুন্দরী কি আজ আবার উঠে আসতে পারে ?

নাই পারুক,—তা বলে স্কটের দেশ, বার্নসের দেশ আগেকার চেয়ে কম সুন্দর বলে মনে হল না। কিন্তু আমার গন্তব্যস্থল তো এখানে শেষ হয়ে যায়নি।

সভ্যতার বাইরে হাইল্যাণ্ডসের জনপ্রাণিহীন পর্বতের মধ্যে আমায় যেতে হবে। যেখানে পর্বতবেষ্টিত হ্রদগুলির নীরবতার দিকে আকাশ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে, আর অতলান্ত মহাসাগর এসে তাদের ডাক দিয়ে যায়।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্। আমাদের ট্রেন গ্রাম্‌পিয়ান শৈলমালার তলা দিয়ে চলেছে। পথে কত ঝরনার লীলা, কত হেদারের মৃদু অস্পষ্ট গন্ধ। আর সমস্ত আকাশ ঘিরে বিখ্যাত ক্যালিডোনিয়ার মেঘের স্নিগ্ধ শোভা।

মরুভূমিতে উটকে বলে দিতে হয় না সে কোথায় এসেছে। তেমনি হাইল্যাণ্ডসেও কাউকে বলে দিতে হবে না সে কোথায় এসেছে। এ দেশ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে চিত্তকে স্পর্শ করে, নিজেকে অনুভব করিয়ে দেয় আকাশের মেঘের ঘন নীলিমা, পাহাড়িয়া হেদারের ম্লান লালিমা, বন-হরিণের স্বেচ্ছাবিচরণ, তার উপর মেঘের গুরুগুরু ডমরু-রব। আপনি মনে জাগে কালিদাসের :

আষাঢ়সিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
কাদম্বমর্ধোদ্গতকেশরং চ
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাম্—

রামায়ণের মেঘশ্যাম বিটপীবহুল অরণ্যানীর কথা মনে করে ভাবলাম যে, এই হচ্ছে ইয়োরোপের 'জনস্থান'। সন্ধ্যাবেলা আথ্‌নাশেলাথ্‌ নামে একটি অজ্ঞাত স্টেশনে নেমে পড়লাম। এই নাম, বোধ হয়, এদেশের ভূগোলের পাতায় পাওয়া যাবে না। এই অভিযানের বর্ণনা দেবার জন্য কোন সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতাও সেখানে ছিল না। তার দরকারও ছিল না। সে কথা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলাম।

ওই পথটি কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু যে পাহাড়টিতে

নিয়ে যাবে সেখানে আছে অতন্দ্র নীরবতা, হেদারের বর্ণগরিমা, আর বর্ষাসিক্ত 'পীট' মাটির একটা অবর্ণনীয় গন্ধ। একটা প্রাচীন অক্ষুণ্ণ শান্তির আভাস বুঝি ওখানেই আছে। তবু জানি যে এখানকার ভীষণ রমণীয়তার মধ্যে অতীত যুগের বিভিন্ন গোত্রের (ক্ল্যান) হিংসা ও রক্তপাতের ইতিহাস ওই হেদারের রঙ-এর পিছনে লুকানো রয়েছে।

পাহাড়ের কাঁধের উপর ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে। কিন্তু তার কোন বাঁকে অতর্কিতে কোন অতিথিপরায়ণ কুটীরের হনিসাকল বা হলিহকগুলি মাথা নেড়ে ক্লান্ত পথিককে বিশ্রামের জন্য ডাক দেবে না। কোন সমুদ্রযাত্রাশ্রান্ত নাবিক পল্লীগাথার অনুসরণে এখানে কোন গৃহস্বামীকে পথ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না এবং তার কাছ থেকে মিষ্টি উত্তর পাবে না, "হে শ্রান্ত নাবিক, আমার একটি রূপসী কন্যা আছে, তুমি যদি আর সমুদ্র অভিযানে না যাও, তা হলে তাকে পাবে।" সেই পল্লীগীতির গৃহস্বামী ও তার কন্যার আতিথ্য দূরে থাক, পা দুখানি যখন অচল হয়ে উঠেছে, তখন ওই নির্জন নিষ্করুণ পর্বতে একটি ঘোড়াও পাওয়া যাবে না।" মনে মনে বলতে থাকি—"হে পাদপদ্মযুগল, তোমরা তো আমার নও, আমার বুটদ্বয়ের; তবে আমাকে আর কষ্ট দাও কেন?"

সারাদিন পাহাড় চড়াইয়ের পর একটি "ইয়ুথ হোস্টেলে" এসে পৌছোনো গেল। এই হোস্টেলগুলি ১৫।২০ মাইল দূরে দূরে কোন ঝরনা বা হ্রদ বা সমুদ্রের ধারে খোলা হয়েছে। কোন পুরানো চাষার বাড়ি বা ধানের গোলাকে হোস্টেল করা হয়েছে। তাতে দুটি শোবার ঘর, একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। খড়ের তোষক মাটিতে পাতা, আর তিনটি করে কম্বল প্রত্যেকের জন্য আছে। শীত যে রকম সে হিসাবে শরীরের উপরে ও নীচে ভাগ করে কম্বল গায়ে দিতে হবে। নিজস্ব একটি ঘুমাবার বস্তায় শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে খড়ের বালিশে মাথা দিয়ে সারাদিন পরিশ্রমের পর সুখে ঘুমানো খুব সহজ ব্যাপার।

একটি 'কমন রুম' আছে, সেখানেই উনান ও কাঠ আছে, কাজেই একাধারে রান্না ও আড্ডা চলে। নিজেই বাসন মেজে, কম্বল প্রভৃতি রোদে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা করতে হবে। তিন রাত্রির বেশী এক হোস্টেলে থাকা নিষিদ্ধ।

খাবার জিনিস সেখানেই কিনতে পাওয়া যায় কখনো কখনো—আলু, ডিম,

দুধ, রুটি, মাখন ও টিনের জিনিস। তবু ওগুলো নিজের পিঠের 'রুকস্যাকে' বয়ে নিয়ে চলাই সুবিধে। প্রত্যেক হোস্টেলে রাত্রিবাসের ও জিনিসপত্র ব্যবহারের জন্য একটি শিলিং মাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। এই হোস্টেল-সমিতি না থাকলে দুর্গম হাইল্যাণ্ডস্ সাধারণ লোকের কাছে অজ্ঞাত ও সত্য সত্যই অগম্য থেকে যেত। এখানে হোটেল বলতে কিছুই নেই—যা আছে তাও জমিদারপল্লীতে এবং সেখানে খরচ ইয়োরোপের দামী ও সভ্য হোটেলের চেয়ে বোধ হয় বেশী। কোন চাষা রাত্রে অতিথি রাখতে পারে না, কারণ জমিদারের কড়া নিষেধ। এখানকার জমিদাররা এ দেশকে সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ শিকার-স্থানেই পরিণত করেছেন। আমেরিকার লক্ষপতি ও ভারতবর্ষীয় মহারাজারা এদের অতিথি হয়ে আসেন হরিণ ও গ্রাউজ শিকারের জন্য। অবশ্য কাঞ্চনমূল্যে সেজন্য সাধারণ লোকের আগমন এখানে অবাঞ্ছিত। তাতে শিকার নষ্ট হয় ও আভিজাত্যের দাম কমে যায়। কিন্তু এই সব নিরালা কোণের দিকেও টুরিস্টদের নজর পড়ছে। এগুলি শীঘ্রই আধুনিক ও সভ্য হয়ে উঠতে বাধ্য।

এরা দেশকে ভালবাসে। দেশের প্রতি অজ্ঞাত কোণটিকে আবিষ্কার করে, সুন্দর করে সাজিয়ে, বিদেশীকে দেখিয়ে এরা প্রশংসা পেতে চায়। এদেশে সৌন্দর্যচর্চা লোকের মজ্জাগত, সেজন্য কোন সুন্দর জিনিসকে এরা নষ্ট হতে দেয় না। এই যৌবনের দেশে শুধু মোটরে বা ট্রেনে দেশ ঘুরে এরা সন্তুষ্ট নয়, পায়ে হেঁটে তন্ন তন্ন করে দেশকে জানতে চায়। সেজন্য কত জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর এই আনন্দ সকলেরই জন্য। যে গরীব, যার ছুটি বৎসরে মাত্র আগস্ট মাসের পনেরো দিন, সেও বেড়াতে যাবে। তার জন্য কোন হোটেল নাই বা থাকল! প্যারিসে ভিয়েনায় যদি সে নাই যেতে পারল, নিজের দেশের মুক্ত প্রান্তর পর্বত অরণ্যানী তার জন্য রয়েছে। দেশের ভ্রমণ সমিতি তারও দাবি মিটাবার কথা ভুলে যায় নি।

সন্ধ্যাবেলা হোস্টেলের বারোয়ারী ঘরে এসে বসা গেল। নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ। এখানে জাত নেই, পাণ্ডিত্যের ভয় নেই, অর্থের আঘাতপ্রবণতা নেই। যার যতরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, যার জীবনে যত মজার ঘটনা সব বিনিময় হতে লাগল।

এরা কেউ কাউকে আগে দেখে নি, কারো মত বা স্বভাবও জানে না। তবু প্রত্যেকের নিজের প্রকৃতির তীক্ষ্ণ কোণাগুলি ঘষে মেজে তৈরী করে নিতে

হয়েছে—অপরের কাছে যেন সেগুলি বিরূপ না হয়। এইখানে ইয়োরোপীয় সামাজিক ভদ্রতার অকপট পরিচয় পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে সাধারণত সত্যনিষ্ঠ আন্তরিকতার নামে যে সমালোচনা চলে আসে তার চেয়ে ঐ অকপট আলাপ-পরিচয় অনেক বড়, অনেক সভ্য।

নিত্যগতিশীল জীবন ইয়োরোপের। কে বা কাকে চেনে? অথচ এক দিনের দেখায় কত আলাপ হয়ে গেল! শহরের স্বল্পভাষিতা, গম্ভীরতা দূর করে সবাই আলাপ করতে লাগল। কারুর কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই। কাল কাউকে চিনব না, তবুও আজকের জন্য আমরা কেউই যেন অপরিচিত নই। আনন্দের অংশীদার হতে কোন বাধা নেই, বিশেষত সবারই উদ্দেশ্য যখন এক, পথ ভিন্ন হলেও।

কে কোন্ পথে পাহাড় চড়াই করে এসেছে, কোথায় কোন্ আঁকাবাঁকা ঝরনা আছে, তার বর্ণনার মধ্যে এক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হল। ইনি সপরিবারে এসেছেন পায়ে হেঁটে। যৌবনে বিয়ের মধুমাস যাপন করবার জন্য যুগলে পদব্রজে হাইল্যাণ্ডসে এসেছিলেন। তখনকার দিনে ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক বন্ধনের ফলে সেজন্য এঁদের বহু ঠাট্টা ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। এখন বৃদ্ধ বয়সে সেই মধুমাস ঝালিয়ে নেবার জন্য আবার এখানে এসেছেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক—র বুদ্ধি ও তারুণ্যের প্রশংসা করতে হবে। তাঁরই ছোট মেয়ে গোয়েন একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে ছেলেভুলানো মিষ্টি ছড়ায় বলছে যে হোস্টেলের বাইরের ঝরনাটাতে একটি পরী থাকে।

আমরা সবাই সাব্যস্ত করলাম যে সে নিজেই সেই পরী। আর তার ভাই ডেভিড—চেহারায় কিন্তু সে গলিয়াথের মত—কেউ তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে ক্ষুন্ন মনে এই পাহাড়ে কোন্ ক্ল্যান রাজত্ব করত তার ইতিহাস জানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

কে জানত যে, সর্বদা আমাদের কাজ করে দিতে প্রস্তুত, বিনয়ী বন্ধু 'বিলের' মধ্যে এডিনবরার একজন উদীয়মান সলিসিটার লুকিয়ে আছে?

কেই বা জানত যে, যে চশমাপরা লোকটি তার স্কচ কথা দিয়ে সবাইকে হাসাচ্ছে, সে হচ্ছে একটি ব্যাঙ্কার?

এই বিচিত্র দলটির মধ্যে হঠাৎ নৃত্যচ্ছন্দে আবির্ভূত হল হাস্যমুখর তিনটি

ডাণ্ডী শহরের মেয়ে। একজন শ্রীমতী দণ্ডী গান গেয়ে বলে উঠলেন যে, তিনি ডিম যোগাড় করতে পেরেছেন। তাজ্জব ব্যাপার! "আমরা কেউ কোথাও পেলাম না, তোমরা কি করে পেলে হে!" কিছুক্ষণ পরিহাসের পর তারা স্বীকার করল যে, কাল যে ডিম পাড়বার সম্ভাবনা আছে সেগুলির জন্য আজ দাদন দিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে নানারকম পল্লী-সঙ্গীত আরম্ভ হল। সবাই তাতে যোগদান করল। তারপর একজন এডিনবরার ছাত্র তাদের কলেজের নূতনতম সেই "craze" গানটি ধরল, সে বলল, "ওহে আমার সাগরপারের বন্ধু, এই গানটা তোমার শোনা উচিত, নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমার হাত আছে :

"My bonnie is over the ccean,
My bonnie is over the sea ;
Bring back, oh, bring back,
Bring back my bonnie to me."

আজকের এই হাইল্যাণ্ডসে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। ভোরের "গ্রাউজের' বা দ্বিপ্রহরের বনহরিণের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা মোটরের হর্ন এখানকার আদিম নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে যায়। এখানে আজ যে 'কিল্ট' পরে বেড়াবে লোকে নিঃসন্দেহে বুঝবে যে সেই হচ্ছে বিদেশী।

এখানকার সবগুলি পর্বত ও হ্রদের উপর যেন একজনের সত্তা ও প্রভাব বিরাজ করছে। তিনি হচ্ছেন "বনি প্রিন্স চার্লি"। পৃথিবীর এই ভূখণ্ডের যত বীরত্বের গান, যত চারণ-গাথা সবই তাঁকে ঘিরে। এদেশের একটি বীর্যময় ও অত্যাচারিত যুগের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন চার্লি। আজও ঝড়ে নৌকা-ডুবির আশঙ্কা হলে মাঝিরা গেয়ে উঠবে তাঁর গান, থেকে থেকে সে গানের ধুয়া সমস্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে—"Will he na come back again ?"

আর মানসপটে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শিঙাধ্বনি ও অগ্নি-সঙ্কেতের মধ্যে জেগে উঠবে একটি তরুণ প্রিয়দর্শন রাজপুত্রের পলায়মান চিত্র। তাঁর মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে অথচ তাঁর রক্ষার জন্য ভীষণ নিশীথে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপর দিয়ে একটি বীরবালিকা একাকিনী অভিযান করেছেন। অন্ধকার যখন হ্রদগুলির উপর ঘনিয়ে আসে, পাহাড়ের নীচে ছায়া যখন দীর্ঘ হতে

দীর্ঘতর হয়ে মিলিয়ে যায়, তখন মনে হয় ওই গানের ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অরণ্যান্তরে "বনি প্রিন্স চার্লি" এখনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

স্কটল্যাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের এক-একটি যুগের কল্পনা আর পরিচয় এক-একটি বিশেষ মূর্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাদের নামেই এরা ব্যবসা চালায়, তাদের কল্যাণেই এদের দিন চলে। যতদিন স্কটল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড থাকবে ততদিন স্কটের স্মৃতি একটি বিরাট সত্তার মত বিরাজ করবে।

আর-একটি মূর্তি হচ্ছে গ্রাম্য কবি, গ্রামের প্রাণের কবি বার্নসের। এ দেশের প্রেমিক-প্রেমিকারা চিঠি লিখবে বার্নসের রচনা উদ্ধৃত করে :

"My heart is sair, I dair na' tell"

উপহার পাঠাবে হাইল্যাণ্ডসের ক্ল্যানদের (গোত্রের) পোশাক, tartanএ বাঁধাই ছোট ছোট স্কট বা বার্নসের বই, আর প্রিয়ার মুখের সঙ্গে তুলনা করবে রূপসী রানী মেরীর। দেশের যেখানে যাই, ঘুরে ফিরে এদের ও রাজপুত্র চার্লির কথা উঠবে বা তাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখানো হবে। হলিরুড প্রাসাদে গাইড এমনভাবে রিকিয়োর হত্যা-কাহিনী বর্ণনা করবে, মেরীর শয়নকক্ষ দেখিয়ে দেবে, যেন তারা হচ্ছে মাত্র গতকালের বিদায় নেওয়া বন্ধু, সল্‌স্‌বারি ক্র্যাগের ওপাশ দিয়ে যেন পলায়মানা রানীর ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি।

২

ইতিমধ্যে আর একটি নূতন মূর্তি এই জনবিরল ভূমিখণ্ডের শ্যাম অরণ্যানী ও অকরুণ পর্বতমালার সামনে রূপ ধারণ করে উঠেছে।

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—"

মৈত্র মহাশয়ের মত এই ভারতীয়ের বিজ্ঞাপন চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। এজন্য কোন নিজস্ব সংবাদদাতার প্রয়োজন হল না; অথচ বাতাসের আগে আগে গ্রামে গ্রামে এই অভাবনীয় আবির্ভাবের সংবাদ পৌঁছে যেতে লাগল। একদিন দারুণ রোদ উঠেছিল; টিনের খাবার আর পোশাকে ভরা "রুকস্যাকের" ভারে পাথরভরা পাহাড়িয়া পথে প্রতিটি পদক্ষেপকে যন্ত্রণা মনে

হচ্ছিল, আর সে পথের শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সে সময় পথের কষ্ট কমাবার জন্য ও শ্রোতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বাংলা কুচকাওয়াজের গানের নমুনা-স্বরূপ

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে চল" ইত্যাদি

গেয়েছিলাম। তার বিদেশী কথা ও বিচিত্র সুর গায়কের আগমনের আগে আগেই—বোধ হয় বেতার সহযোগে সব হোস্টেলে পৌঁছে যেতে লাগল। প্রত্যেক পথচারী ও পর্বতবাসীর মুখে একটু একটু অর্থপূর্ণ চাপা হাসিও যে খেলে গিয়েছিল সে রকম সন্দেহ করলে ভুল হবে না।

আর একবার জন্মতিথির উৎসব পালন করবার অসম্ভব সাধ মনে জেগে উঠল। মোটা চাল কোন রকমে মিলল বটে, কিন্তু ডালের অভাবে ভাঙা ছোলার সন্ধান করতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। সমুদ্রের পার ধরে ধরে বাইশ মাইল হাঁটার পর অ্যাটলান্টিকের যে বন্দরে সপ্তাহে একদিন জাহাজ খাবার জিনিস নিয়ে আসে সেখানকার অমূল্য সবে-ধন-নীলমণি দোকানটিতে হাজির হলাম। দেখি যে, ম্যাক্রি সাহেবের ডাকঘর, জুতামেরামত ও মুদীখানার কাজ একই দোকানঘরে জাঁকিয়ে চালানো হচ্ছে।

সেখানকার জিনিসে যা রান্না হল তা অপূর্ব। মসলাহীন, তেজপাতাহীন খিচুড়ির ঈষৎ পোড়া গন্ধ সমস্ত হাইল্যাণ্ডসের আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে গেল। তিন দিন পরে বন্ধুহীন বন্ধুর 'বেন টরিডনের' চূড়ায় বিশ্রাম করতে করতে যখন অপরাহ্ণ সূর্যের আলোয় হেদারের রঙ বদলানো দেখছি, রোয়ান গাছের শাখায় শাখায় যখন ফুলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আর দিগ্বলয়ের বিলীয়মান রেখার এপারেই নীচের হ্রদটিতে একটা সান্ধ্য তন্দ্রার ভাব এরি মধ্যে নেমে আসছে, তখন দুটি কিশোরী মিষ্টি হেসে জানিয়ে দিল যে তাদের দেশের এই নূতনতম রোমাঞ্চকর সংবাদটি তারাও জেনে ফেলেছে।

আর একদিন সমস্ত বেলা পাহাড় চড়াই করার পর নীচে নামবার পথে একটি ঝরনার পাশে ছায়ায় বসে রুটি, মাখন ও চিনি সহযোগে রাজকীয় 'লাঞ্চ' ভোজনের চেষ্টায় আছি, এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে একটি দীর্ঘকায়, বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের মুখ দেখা গেল। গাছপালার ওপার থেকে এক সকৌতূহল প্রশ্ন বের হয়ে এল—"ওহে, তুমি কি সেই ভারতীয়"—প্রভৃতি।

একটা জিনিস ভারি ভাল লাগে। এদের চেয়ে থাকার মধ্যে ঔৎসুক্য আছে, ঔদ্ধত্য নেই ; প্রশ্নের মধ্যে সম্ভাষণ আছে, সন্দেহ নেই।

এ তো তবু হাইল্যাণ্ডস্—যেখানে লোকে ইংরাজী বোঝে। ইয়োরোপের সর্বত্র এই অতিথিপরায়ণতার ভাব পাওয়া যায়, বিশেষ করে স্পেন, জার্মানি ও ইটালিতে। বিদেশীর মুখ যখন মূক হয়ে গেছে ভাষার অভাবে, মন সেখানে ভাবের আবেগে মুখর হয়ে উঠতে বাধা পায় নি। শব্দ যখন হার মেনে স্তব্ধ হয়ে গেছে, নীরবতার ভাষা সেখানে হাতের গতিতে, চাহনির ভঙ্গীতে কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

*   *   *   *   *

হাইল্যাণ্ডসের একটি বালিকা একাকিনী ধান কাটতে কাটতে গান গেয়ে কবি ওয়ার্ডস্বার্থকে একটি নির্জন দ্বীপপুঞ্জের কথা ও তার সঙ্গে কিছু অকথিত বাণী, অগীত গান, অব্যক্ত ব্যথাব কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেই দ্বীপপুঞ্জ এই যাযাবর বিদেশীকেও ডাক দিল। অতলান্ত মহাসাগরের কল্লোল ছাপিয়ে সেই অশ্রুত গানের আহ্বান আমার কানে এসে পৌঁছল।

কি অদ্ভুত দ্বীপ হচ্ছে এর 'স্কাই' (Skye) দ্বীপটা ! মেঘ ও কুয়াশার ভিতর দিয়ে পথ হাতড়িয়ে এখানে পৌঁছিয়ে মনে হল যে আরব্য উপন্যাসের কোন এক রহস্যময়ী জাদুকরী এক সুন্দর নির্জন বাগান তৈরী করে বাঁশির ডাকে বিদেশীকে টেনে এনে সব অধিবাসীকে নিয়ে বোধ হয় আত্মগোপন করেছে। একাধিক সহস্র রজনীর একটি যেন কুয়াশার অন্ধকারে ঢেকে আমার সামনে উদয় হল।

পায়ের তলায় পাথর-ছড়ানো চড়াই , উপরে মেঘের চন্দ্রাতপ, সামনে অদৃশ্য পর্বতের ভিতর দিয়ে ১৭ মাইল অজ্ঞাত পথ। সে পথে দুটি গোত্রের মধ্যে একটা বিশ্বাসঘাতকতাময় ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে একটা গোত্রের বংশে বাতি দিতে কেউ ছিল না। এপার থেকে তৃষিত নয়নে একবার ওপারে হাই-ল্যাণ্ডসের দিকে ফিরে তাকালাম। এই কুহেলিকার আবরণের পরপারে যে একটি শ্যামল সরস দেশ আছে তা এখন কল্পনা করতেও মনে বাধতে লাগল। এপারের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, বারিধারার সিক্ততা ও "কুলীন" পর্বতের নগ্ন নিষ্ঠুর ঊষরতা ওপারের কাছে অজ্ঞাত হয়ে গেছে। ওপারে গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ পর্বত 'বেন নেভিসের' তলায় নদীকলধ্বনিত শ্যাম বনপথে চলতে

চলতে কারো হয়তো মনেই হবে না যে, এপারে এমন একটা বিচিত্র দেশে নির্মম প্রকৃতির লীলা চলছে।

ডি. এল. রায়ের নন্দলালকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দেশের জন্য তার আত্মজীবন সযত্নে বাঁচিয়ে চলবার দরকার পড়েছিল। তাই সে কখনো কোন কষ্টসাধ্য কাজে হাত দেয় নি। জীবনটা যদি দিই, না হয় দিলাম—কিন্তু, "অভাগা দেশের হইবে কি ?" তেলে-জলে মানুষ নিরীহ বাঙালী হিন্দুর সন্তান নন্দলাল কেন ওই ক্যুলীন পর্বতে জীবনসংশয় করতে যাবে?

কিন্তু ইয়োরোপের হাওয়া বোধহয় আমাদের সনাতন নন্দলালকেও ঘাড় ধরে নিরুদ্দেশের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পথে বের করে আনতে পারবে। তা যদি পারে, তবেই ইয়োরোপের শিক্ষার ফল আমাদের উপর ফলবে। যুগধর্মের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে আমরা এগিয়ে চলতে পারব।

বিদেশে এসে আমরা শুধু একমনে পরীক্ষা পাস করে যাব। কূপের মধ্যে মণ্ডূকের মত যার সীমাবদ্ধ নিগড়বদ্ধ জীবন ছিল সে আহার্য অন্বেষণে পাখির মত আকাশে উড়ে খড়-কুটা সংগ্রহ করেই ফিরে যাবে, ওই অসীম প্রসারের, মোহন নীলিমার একটুও আস্বাদ গ্রহণ করবে না—একথায় কিছুতেই মন সায় দেয় না।

সামনের ক্যুলীন পর্বত ভয়াবহ বিপজ্জনক হতে পারে, তবু তার উপরও তো প্রাণ হাতে নিয়ে পায়ে কোমরে দড়ি বেঁধে লোক উঠছে। সে দৃশ্য দেখে একুশ বছর বয়স পিছনে পড়ে থাকবে পরাজয়ের লজ্জা ও ব্যর্থতার গ্লানি স্বীকার করে—এ কি করে সহ্য করা যায় ?

হাইল্যাণ্ডসের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'লখ মারী' হ্রদের মাঝখানে একটি 'অপ্সরা দ্বীপ' আছে। সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ কালবৈশাখীর উন্মত্ত ঝড়ে নৌকা ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিল। তখন আমরা উত্তাল তরঙ্গে অসহায় শিশুর মত ভেসে যাবার জন্য প্রস্তুত হই নি। অথবা ক্ষীণকণ্ঠে ভগবানের নাম স্মরণ করে ক্ষান্ত হই নি। সেদিন আমরা কবি ক্যাম্বেলের 'লর্ড আলিনের কন্যা' কবিতাটি আবৃত্তি করে উৎসাহ সঞ্চার করেছিলাম। তারপরে ঠিক করলাম যে, এসো সবাই মিলে গান ধরা যাক।

তখন বুঝতে পারলাম যে, জড়বাদ বস্তুবাদ প্রভৃতিতে ডুবে থেকেও ইয়োরোপ কেমন করে নির্বিবাদে জরাকে জয় করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে।

এদের আমাদের মত আধ্যাত্মিক সম্পদ নেই; তবু এরা আমাদের চেয়ে

কত বেশী আনন্দ পেয়ে যাচ্ছে। সকলেরই জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুতে; তবে কেন যে কদিন বেঁচে থাকবে সে কদিন প্রাণের প্রাচুর্য থাকবে না? যে কখনো ভোগই করল না, তার ত্যাগের মহৎ দুঃখ লাভের সৌভাগ্য কোথায়? মলিন পুষ্করিণীর উপরের শৈবালদল সরিয়ে এক ঝাপটায় নীচের জলবিন্দুটুকু তুলে নেবার চেষ্টার মতন অসম্পূর্ণভাবে যে সংসারকে গ্রহণ করল, সে সংসারীর সন্ন্যাসে মহিমা কোথায়? যে আত্মনির্ভরশীলতায়, সাহসে ত্যাগে আমরা দুঃখ-বিপদকে তুচ্ছ করতে পারতাম তা আমাদের নেই। আছে শুধু দুর্বল কান্না। তাই জীবনকে দেখি অসহায় চোখ দিয়ে।

এমনই ইয়োরোপে মানুষের প্রকৃতি আপনা থেকে অকারণে সুদূর অনির্দিষ্টের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার ওপর বহিঃপ্রকৃতি যখন অন্তঃপ্রকৃতিকে ডাক দেয় তখন মনে যে বিচিত্র লীলার আভাস পাই তার পরিচয় কি করে দেওয়া যায়?

একবার সারাটা দিন ক্যালীন পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে নীচে নেমে আসছি; শ্রান্তি সত্ত্বেও জয়ের আনন্দ ফুটে উঠছে, আর বহুদূরে যেখানে রাত্রির আশ্রয় মিলবে সেই হোস্টেলের অনাড়ম্বর আরাম ও বাহুল্যহীন বিলাসের কথাও মনে জেগে উঠছে। তখন নীচের ঝরনায় দুটি বালিকাকে বসে থাকতে দেখা গেল। কনককেশিনী তাদের কেশে-বেশে মেঘমুক্ত একটি সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে; তাদের নীল সরল চোখে তাদের দেশের মেঘান্তরালের নীলনভস্তলের আভা যেন ধরা পড়েছে; আর মনে হচ্ছে যেন সমস্ত হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জের আত্মার প্রতীক হয়ে বসে আছে তারা। একটি কথা আপনি মনে এল—'বিদেশিনী'।

এই বিদেশিনীকে ঘিরে কত কল্পনা, কত কাব্যরচনা, কত হৃদয়োচ্ছ্বাস! যাঁর সন্ধানে রূপকথার রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সাত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে-ই বিদেশিনী। বৃক্ষলতায় অনন্ত আনন্দমর্মরে, শুভ্র অভ্রদলের লীলাকলায়, ঘনবনশয়নের শ্যামলিমায় যার আভাস পাই সে-ই বিদেশিনী। সে কিন্তু চিরকাল সন্ধানের ও প্রাপ্তির অতীত হয়েই রইল—সে শুধু একটা আনন্দের কণিকা—যাকে অনুভব করা যাবে, স্পর্শ করা যাবে না, দেখা যাবে না। গোপন বলেই সে মধুর, নীরব বলেই তার জন্য কবির বাঁশি চিরন্তন মুখর, অপ্রকাশ বলেই তাকে প্রকাশ করবার জন্য ভুবন-ভরা এত আয়োজন। কিন্তু সে তো মানবের দেশের নয়, সে যে বিদেশিনী।

৩

একটি উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন।

'লেক ডিস্ট্রিক্টে'—ডারওয়েন্ট ওয়াটার হ্রদের কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াচ্ছি। স্কাই দ্বীপের সেই পাগলামিভরা দিনগুলি অনেকটা পিছনে পড়ে রয়েছে। "গ্লেন ব্রিটল" নামক জায়গায়—যেখানে অতলান্ত মহাসাগর ও নদী এক হয়ে দিগন্তে মিশে গিয়েছে তার পাড় ধরে ধরে সারাদিন কাঁটায় ভরা জঙ্গলে "ভাইকিং'-দের কবর খুঁজে বেড়ানোর পাগলামি এখন আর নিজেই অনুমোদন করব না।

সেখানে লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রতি হ্রদে পর্বতে গিরিগুহায় কোন-না-কোন যক্ষ বা প্রেতাত্মা বা ওইরকম একটা কিছু আছে; প্রত্যেক জায়গার সঙ্গে উপদেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে গল্প জড়ানো আছে। আর প্রত্যেক লোকেরই নিজের বংশের মধ্যে সর্বস্বত্বসংরক্ষিত ভূতের কাহিনীও পাওয়া যেত।

সে সব রাত্রিতে সময় কাটাবার রোমাঞ্চকর উপায় ওয়ার্ডস্বার্থের এলাকায় পাওয়া যাবে না। এখানে শুধু একটি মধুর প্রকৃতির বালিকার আত্মা আছে। সে হচ্ছে পৃথিবীর তিলোত্তমা বালিকা—কবির মানসসৃষ্টি লুসি গ্রে। লুসিকে পৃথিবীর খুব কম লোকেই দেখেছিল; কিন্তু কবি তাকে যেভাবে দেখেছিলেন তা আমাদের কাছে অমর হয়ে আছে। লুসি যে আমাদের কাছে ধরা না দিয়ে অলক্ষ্যে পাহাড়িয়া ঝড়ের রাতে শিস দিয়ে দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায় সে কথা যে-কোন গ্রামবৃদ্ধা এখনো হলপ করে বলতে পারে।

হাইলাণ্ডসের সঙ্গে লেক ডিস্ট্রিক্টের তফাত যে শুধু এইখানে তা নয়। তবে এ থেকেই প্রভেদের মূল সুরটুকু বুঝতে পারা যাবে। উত্তরাঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে পাই ভীষণ রমণীয়তা, এখানে পাই স্নিগ্ধ কমনীয়তা। সেখানে পাই আদিম জীবনের উল্লাস, এখানে মার্জিত রুচির বিকাশ; সেখানে পেয়েছি আনন্দ, এখানে পেলাম পরিতৃপ্তি।

এই দুটি অঞ্চলের ইয়ুথ হোস্টেলের সংলগ্ন প্রান্তর দেখলেই বোঝা যাবে, লেক ডিস্ট্রিক্টে কবি শান্ত স্নিগ্ধ যে প্রকৃতিতে আনন্দ পেয়েছিলেন মানুষ সে প্রকৃতিকে অপ্রাকৃত চেষ্টা দিয়ে সুন্দরতর করে তুলেছে। উত্তরাঞ্চলে মানুষ

গিয়েছে প্রাণের চঞ্চলতার বশবর্তী হয়ে; তার পদচিহ্ন প্রকৃতি স্বহস্তে মুছে নিজে নিজ গম্ভীর মহিমায় লুপ্ত থাকবে।

এই হ্রদগুলির আশেপাশে যে-সব লোক বেড়াতে এসেছে তাদের মধ্যে অনেক ধনী বিলাসীও আছে। কিন্তু তাদের আমরা পথচারীর দল গণনার মধ্যেই আনি না। তারা হচ্ছে শান্তিভঙ্গকারী। নির্জনতার পবিত্রতা তারা ধ্বংস করেছে। তাদের মোটরগাড়ির বহর ও হোটেলের চর্ব্যচূষ্যের তালিকা নিশ্চয়ই ওয়ার্ডস্বার্থের আত্মার অসম্মান করছে এবং গ্রাসমেয়ার হ্রদের রাজহংসটির জলকেলির সঙ্গেও তারা সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না, একথা মনে করে সান্ত্বনা লাভ করে হ্রদের মধ্যে নৌকা বাইতে নেমে পড়ি। তারা পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখে বা মটরলঞ্চে ঘুরে বেড়ায়।

"উইনাণ্ডর" হ্রদের তীরে কবির সৃষ্ট একটি বালক পেঁচার ডাকের অনুকরণের পর গভীর নীরবতার মধ্যে, জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে, প্রকৃতির বিরাট আহ্বানে হঠাৎ হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিল। তার মত সৌভাগ্য কোন না-কোন দিন হয়তো পাব। তাহলে আমাকে ওই মোটরবিহারীর দলের মত কবির বাড়ির দোকান থেকে একটি কবিতা সঞ্চয়ন কিনে নিয়েই ফিরে যেতে হবে না। জীবনে পবম ক্ষণ অতি দুর্লভ, এবং অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই তা আসে। তার জন্য অহরহ নিজেকে প্রস্তুত রাখব।

গ্রাসমেয়ারের হোস্টেলে সেদিন রাত্রে মহা আনন্দ। একদল জার্মান 'হাইকার' পথচারী ও পথচারিণী এসেছে। তারা নানা কলাবিদ। ইংলণ্ডের মত দেশেও এরা নিজেদের আত্মবিশ্বাসের গভীরতায়, উৎসাহের প্রাচুর্যে নিয়মানুবর্তিতায় সকলকে চমৎকৃত করে দিল। রাত্রে তারা নানা ভাষায় কত গান গাইল, কত বিভিন্ন রসের ভাবের গান। দেখে মনে হয় যেন এরা এদের দেশের প্রতিনিধি হয়ে বিদেশে এসেছে। যেখানে যায় সৌজন্যে ও চরিত্রের বিশেষত্বে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

ইতিমধ্যে আরো গভীর রাত্রে একটা ব্যাপার হল। অন্ধকার সিঁড়ির এক কোণা থেকে ধীরে ধীরে একটা অস্ফুট স্প্যানিশ গীটারের ধ্বনি উঠল, ধীরে ধীরে সে ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল আর তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় 'টেনর' কণ্ঠে একটি ইটালীয় গান আরম্ভ হল—"সোলো পারা তে লুসিয়া', লুসিয়া শুধু তোমারই

জন্য। এই বিখ্যাত গানটি বর্ত্তমান ইটালির শ্রেষ্ঠ গায়ক জিলি (Gigli) স্বয়ং রেকর্ডে গেয়েছেন। সে গান যেন সমস্ত হোস্টেলকে মন্ত্রমুগ্ধের মত করে রাখল।

নিয়ম হচ্ছে যে রাত্রি ১১টার পর কেউ শোবার ঘরের বাইরে আসতে পারবে না; কিন্তু আমরা সবাই সে নিয়ম ভঙ্গ করলাম। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে অন্ধকারে একটি একটি মূর্তি হাজির হতে লাগল। অনুভবের চিহ্নমাত্রহীন বিরাটমূর্তি 'ওয়ার্ডেন' নিজে সেখানে এল। তার মুখে নিয়মভঙ্গের জন্য বিরক্তি বা নালিশের চিহ্নও নেই। মুখে তার একটা আনন্দের উত্তেজনা, একটা তৃপ্তির আভাস। সেই ইটালীয় গান নীরব নিশীথিনীর অন্তরের সুরটি যেন আমাদের সামনে খুলে ধরল।

তার পরদিন এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'হেলভেলিনে' অনেক কষ্টে চড়লাম। কিন্তু তার চূড়া থেকে ওয়ার্ডস্বার্থের দেশ দেখতে দেখতে পরিশ্রমের কথা একটুও মনে হল না। কার যেন স্নিগ্ধ হস্তের স্পর্শে সব ক্লান্তি সব গ্লানি মুছে গিয়েছে। রাত্রের গানের রেশটুকু বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল যে, ভাল লাগে, ভাল লাগে ইয়োরোপের এ আনন্দময়, উল্লাসময় মুক্ত জীবন, যা পায়ে পায়ে চলে দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে—সে জীবন আমার ভাল লাগে।

'সোলো পারা তে', হে ইয়োরোপা।

নগর ও নাগরিক

১

সভ্যতার মধ্যে ফিরে এলাম।

কিন্তু এ কোন্ লণ্ডন? যাকে রেখে গিয়েছিলাম সেই ফুলে পাতায় সাজানো উৎসবের নগরীকে দেখতে পাচ্ছি না। বহুদিনের প্রোষিতভর্তৃকার মত তার রূপ। তাকে আজ চিনে নিতে মনের মধ্যে একটা ব্যথা লাগে। যে পরিপূর্ণ যৌবনে তাকে দেখে গিয়েছিলাম সে পরিণত শোভা আর নেই। বসন্তসজ্জা তার একে একে খসে যাচ্ছে উৎসবের নিশাশেষের দীপমালার মত।

আমাদের শরৎ আর ইয়োরোপের 'অটাম' ঠিক একরকম নয়, যেমন ভারতবর্ষের ও ইয়োরোপের ঋতুবিভাগ একরকম নয়। বরং অটামে হেমন্ত-আভাস পাই। আমাদের শরতে মেঘের খেলা যা-কিছু আকাশে থাকে তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে, আর লঘু শ্বেতের ভিতর থেকে অম্লান নীলিমা ফুটে ওঠে। এদের শরতে আকাশটুকু ছোট হয়ে দেখা দেয়, দিনের আলো ক্ষীণ স্বল্পস্থায়ী হতে থাকে।

তবু এদের হেমন্তকালও কম প্রাণময় নয়। নাই বা থাকুক তার প্রথম বসন্তের মাধুর্য, পরিণত গ্রীষ্মের উজ্জ্বলতা। কখনো বৃষ্টি, কখনো মেঘ, কখনো কুয়াশা আসে, তবু বাতাসে একটা মৃদুভাব পাই। সূর্য এখনো চোখ-জুড়ানো আলো দেয়, প্রায়-হলদে পাতাগুলিকে কোমলভাবে ছুঁয়ে যায়, পাছে রূঢ় স্পর্শে তা কদিন আগেই বা খসে যায়। অভিশপ্তা পাষাণীভূতা অহল্যার-স্বপ্ন দেখবার সময় এখনো প্রকৃতির আসে নি। এখনো যে—

"হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার"

কিন্তু এ কোন্ আমিই বা লণ্ডনে ফিরে এলাম? সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে বদলাতে বদলাতে যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার হিসাব দিতে পারি না! প্রসন্ন আকাশের উদার নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে সব দেখে নিতে চাই। সব কটি ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ইয়োরোপকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে চাচ্ছে;

পুরাতনকে পিছনে বিস্মরণের মধ্যে রেখে আসতে চায়, পাছে পুরাতনের মায়ায় নূতনের ছায়াটুকুও বাদ দিয়ে যাই। আমার মন যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় এত দূর-দেশান্তরে চলে এসেছে যে আর পিছনে তাকালে কিছুই নজরে পড়বে না।

এখনো আমার ছুটি ফুরিয়ে যায় নি। কিন্তু সারা বছরে যারা পনের দিন মাত্র ছুটি পায় তারা সবাই যে-যার কাজে ফিরে এসেছে। তাদের দিকে কি আমি কৃপার দৃষ্টিতে তাকাব? যে দুই চোখ প্রথম থেকেই বিরাট বিস্ময়ে ও সহানুভূতিতে সমস্ত ভুবন ভরে মেলে দিয়েছিলাম তারা এখনো একটুও ক্লান্ত হয় নি। বিদেশ যেন কোন রহস্যে-ভরা জাদুকরের ইন্দ্রজালের কাঠির পরশে মাধুরী দিয়ে ভরা। তাই দেখে দেখে পুরাতন হয় না।

অতি ভোরের চাকরানীর কর্মব্যস্ততা, দুধওয়ালার দ্বারে দ্বারে দুধ রেখে যাওয়া, কুলিমজুরের বাস বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের পথে দৌড়ানোর মধ্য দিয়ে লণ্ডনের জাগরণের চিহ্ন পাই। তারপর দলে দলে লোক যে-যার কাজে যাবে—পুরুষ ও নারী, যুবক ও বালক কত বিচিত্র সজ্জায় কত বিভিন্ন ভঙ্গীতে চলবে। কত বীরের মত দীর্ঘ সুঠাম দেহ, চঞ্চল লীলায়িত ফুলের মত সুন্দর মুখের শোভাযাত্রা চলবে। তারি মধ্যে হয়তো কোন যুবক পথে একটি যুবতীর সঙ্গে মিলে এক সঙ্গে যেতে লাগল। হয়তো দুজন বন্ধু বা এক অফিসের লোক।

পথে যেতে যেতে চোখের হাসিতে মুখের কথায় ক্ষণিকের সাহচর্যে যেটুকু সুখ তা-ও এই কর্মের আনন্দ-তীর্থের যাত্রীদল বাদ দিতে চায় না। জীবনে হয়তো এদের অনেকেরই অদৃষ্টে বিয়ে নেই, অন্তত প্রথম জীবনে নেই। কিন্তু তবু কর্মস্রোতে এরা পুরুষ ও নারী পাশাপাশি ভেসে চলেছে। পুরুষ নারীকে 'নরকস্য দ্বারং' বলে এড়িয়ে যায় নি, নারী পুরুষকে ভয়ের সামগ্রী বলে পিছিয়ে যায় নি। আর সমাজ দেয় নি এদের মধ্যে আগুন আর ঘির একটি মাত্র সম্বন্ধ নির্দেশ করে।

স্ত্রী-পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে রূপ স্বাস্থ্য ও সামাজিক গুণের চর্চা এদের মধ্যে মনের অগোচরেই বেড়ে গেছে। তার ফলে পুরুষের অহরহ সাধনা নারীর চোখে জনতার মধ্যে একটি জন হয়ে ওঠবার। নারীরও সেই সাধনা। তার ফলে পশ্চিমে মানবজাতিরই উন্নতি হয়েছে সব দিক দিয়ে। আমাদের মত রোগজর্জর বা অসুন্দর হবার লজ্জা ও গ্লানি ইয়োরোপে দেখা যায় না।

কথা উঠেছে যে, বয়স মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার রূপ কমিয়ে দিতে পারত না বা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ নষ্ট করতে পারত না, কিন্তু তাকে এই সব শহরতলির ছোট ছোট গৃহিণীর কাজ করতে হলে দুটি বছরে তার রূপ ও আকর্ষণ সাফ হয়ে যেত।

যে বেচারী ৪০০/৫০০ পাউণ্ড বছরে উপায় করে তার ঘরকন্নায় ক্লান্তা কান্তার কথা ভেবে সবাই দুঃখ করবে। কিন্তু, আমি তো তার দুঃখের কারণ বুঝি না। যতদিন তার যৌবন আছে—এবং এদেশে যৌবন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে—ততদিন সে একটি ঘর বা ফ্ল্যাট নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে স্বাধীনভাবে থাকতে পারত বটে, কিন্তু তার জন্য স্থায়ী কিছু থাকত না।

বরং তার স্বামীদেবতারই ভাগ্য খারাপ। সে যে অফিসে একটানা খাটে তার কোন ফল সে হাতে হাতে দেখাতে পায় না। কিন্তু তার ঘরনী একটি গৃহ দেখাবে যা তার নিজের হাতের তৈরী, নিজের পরিকল্পনার ছাপ তাতে আছে সুরুচি আর সৌষ্ঠবের মধ্যে। ইলেকট্রিক আর গ্যাস তার পরিশ্রমকে হাল্কা ও সভ্য করে দিয়েছে। তবে তার দুঃখ কিসের? আসল কথা হচ্ছে যে, এ যুগে বাইরের জগৎ সবাইকে টানছে। ঘরমুখো কেউ নয়। পায়ে এদের বাঁধা আছে রথচক্র, মুখে বুলি—

"যাব না যাব না যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

পায়ে হেঁটে বের হওয়া গেল। তা না হলে আমার আজকের মানস ভ্রমণটুকু ব্যর্থ হবে। চলার প্রেমে মেতে জনস্রোতে ভেসে ভেসে গিয়েও নিজের উদ্দেশ্যের ঘাটে ভিড়তে হবে। তা না হলে আঁখির পিপাসা মেটে না, মনের অভিযান পূর্ণ হয় না। ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডে এসে লণ্ডন দেখে না, দেখে কিন্তু প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা। তার কারণ হচ্ছে কাছের গঙ্গা ঘাটের পানি। কলকাতার বাসিন্দা কজনই বা গঙ্গাস্নানে যায়?

কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, লণ্ডনের আগে নাম ছিল 'ক্যাথিড্রালের শহর'। সে কথা আজ কেউ মানতে চাইবে না। রোম, সেভিল, কলোন ঘুরে এসেই যে মানুষ সে কথা অস্বীকার করেছে তা নয়। লণ্ডনের গায়ে আজকাল কোথাও একটু 'ক্যাথিড্রালে'র ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেন্ট্‌ মার্টিন্‌স্‌, এমনকি সেন্ট পল্‌স্‌ কারই বা নজরে পড়বে? লণ্ডনের বসতি-পল্লীর নাম করা ছোট

ছোট বাগানগুলি পর্যন্ত আজকাল উৎসবের বেশ হারিয়ে ফেলেছে। ব্লুমস্‌ব্যরীর বাগান তো ইউনিভার্সিটিই গ্রাস করেছে। কাজের দাবির সঙ্গে সৌন্দর্যের দাবির একটা টানাহাঁচড়া শুরু হয়েছে। তার ওপরে লণ্ডন যেমনভাবে ব্যবসায়ের দস্যুদের হাতে পড়ে বদলিয়ে যাচ্ছে তাতে এর স্বার্থবৃদ্ধি হচ্ছে বটে, কিন্তু সৌন্দর্যনাশও হচ্ছে।

জগৎ-জোড়া ব্যবসার কল্যাণে লণ্ডন হয়েছে 'কসমোপলিটান', কিন্তু কমনীয়তা কমেছে। এ নির্মাণ-কৌশলের দৃষ্টান্ত, কিন্তু স্থপতির স্বপ্নদৃষ্টি নয়। তার বিলাস-লীলার কেন্দ্র পিকাডিলির সর্বাঙ্গ লাল-নীল নিয়নের অলঙ্কারে বাঁধা পড়েছে। সেগুলি সুষ্ঠু, কিন্তু সুরুচির পরিচয় নয়। সে বিজ্ঞাপনের আলোর বাহার Erosএর মূর্তি থেকেও পথিকের প্রশংসমান দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে। লণ্ডন মহাশহর কিন্তু মহানগরী নয়; তার টেমস সীন বা দানিয়ুব নয়। ফ্লীট স্ট্রীট দিয়ে এগোতে সেণ্ট পল্‌স্‌ যে কোথায় দুপাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অফিসের ছায়ায় চাপা পড়ে থাকে তা টেরই পাওয়া যায় না। নদীর পথ দিয়ে না এসে ভিক্টোরিয়া দিয়ে এলে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি ও পার্লামেণ্টের প্রায় সেই দশা হয়। পৃথিবীময় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের আওতায় এর ইতিহাসময় আভিজাত্য লোপ পেতে বসেছে।

তবু ভাল, যারা এ দস্যুতা করছে তাদেরও কিছু শিক্ষার অভাব নেই। তারা যা বানাচ্ছে তাকে বড় জোর 'ভালগার' বলা যায়; কিন্তু তাও ভাল লাগার মত, ভাঙবার মত নয়। সেণ্ট পল্‌সের কাছেই যে বিরাট খবরের কাগজের বাড়ি উঠেছে তাকে সৌধ বলব না, কারণ তার মধ্যে না আছে সুধার সৌন্দর্য, না তার সাঙ্গোপাঙ্গ ইঁট বা পাথর। বিরাট সরলরেখা আর কাঁচে সাজানো একটা দানব, কিন্তু দেখবার মত দানব, মাথা তুলে উঠেছে।

ব্রাইটনের একটা নূতন বাড়ির কথা ধরা যাক। আগেকার টিউডর বাড়ির অন্ধ অনুকরণ থেমে গেছে। তার জায়গায় এসেছে কোন জটিল কার্বিকর নয়, রেখার সরল সৌন্দর্য। এই হচ্ছে 'ফিউচারিস্ট আর্টের' মূলমন্ত্র। দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত কাঁচের জানলা চলে গেছে, ভিতর থেকে মনে হয় আকাশ ও সাগরের একটা বিরাট অংশ চোখকে ডাকছে। বাইরে থেকে এই জানালাগুলি একটার উপর একটা প্রতি তলে খিলানের মত চলে গেছে, রাত্রে সমান্তরালভাবে আলোর সারি দেখা যাবে।

তাকে কিন্তু দীপমালা বলব না। এই জানালাগুলি কেবলি জানালা, বাতায়ন নয়, এই কাঁচও স্ফটিক নয়। এই শিল্পে সারল্য আছে, শালীনতা নেই; কৌশল আছে, কল্পনা নেই; আবশ্যকতা আছে, আভিজাত্য নেই।

ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতির ভাবীকালের গ্রামের নিষ্ঠুর পরিকল্পনা হচ্ছে, গ্রামের চার্চটির উপরেই তলায় তলায় প্রকাণ্ড ভাড়াটে ফ্ল্যাটের শ্রেণী; তার মধ্যে থাকবে গ্রাম্য লোক আর তাদের বেতার, টেলিফোন, ডাকঘর।

বিল্ডিং সোসাইটিগুলির কল্যাণে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মটরগাড়ির অহরহ আক্রমণে গ্রাম্য ইংলণ্ডের রূপ বদলাতে বাধ্য। তবু এখনো লণ্ডন ছেড়ে দূরে গেলেই গ্রাম না হোক গ্রামের অখণ্ড শ্যামলিমা ও অক্ষুণ্ণ শান্তি পাওয়া যায়। এমনকি, কোন কোন গ্রামে হঠাৎ হঠাৎ বেদের (জিপ্সি) আস্তানাও পাওয়া যায়। এই 'রোমানি' বংশকে গ্রাম্য ইংলণ্ডে একটুও বেমানান মনে হয় না। কোথাও বা পাই আগেকার সুন্দর সরল লোকনৃত্যের উদাহরণ। গ্রামের লোক ও শহরের লোক মিলে পুরাতন সাধারণ লোকের আনন্দের জিনিসগুলি পুনর্জীবিত করেছে।

এই পুরানো জিনিসকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ভবিষ্যতের গ্রামেও থাকবে। কিন্তু হয়তো থাকবে না তার মধ্যে প্রাণ, থাকবে না প্রাচীন আইভি-ঢাকা গৃহের প্রান্তরে অপরাহ্ণের দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর মিলিয়ে যাওয়া ছায়ায় বাঁশির সুরের তালে তালে স্বচ্ছন্দ আপনা-ভুলানো নাচ। গ্রাম হবে তখন গোল্ডার্স্ গ্রীনের পল্লী-সংস্করণ। তার মধ্যে থাকবে না সেই সবুজ উদার প্রান্তর, সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কুটীরগুলি, তাদের গির্জা ও ইউ, উইলো, পপ্লারে ছায়াচ্ছন্ন নির্জন অঙ্গনটুকু। তার পরিবর্তে আসবে কোন কোন জায়গায় জাতি ও সরকারের তরফ থেকে যত্নে সাজানো খানিকটা 'বিউটি-স্পট' যেটা রবিবারে মটর ও সাইকেলের আরোহীতে ভরে যাবে। আর যেখানে স্লট মেশিনে চকোলেট থেকে আরম্ভ করে জুতা বুরুশের সরঞ্জাম পর্যন্ত সব মজুত থাকবে। তবু সান্ত্বনার কথা এই যে, যে-রকমভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতির মুখে চলেছে তাতে দু-চার পুরুষের মধ্যে গ্রামে Skyscraper বা ফ্ল্যাটের কোন প্রয়োজনই হবে না।

অত বড় কর্মচঞ্চল শহরও বিশ্রামটুকুর কথা ভোলে নি। তাই পাড়ায় পাড়ায় মাঠ, বাগান, ফুলের মেলা। আর সে সব হচ্ছে সকলের জন্য তাই

তার মধ্যে যে সার্থকতা আছে, প্রাচ্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উদ্যানগুলির মধ্যে তা ছিল না।

এগুলি অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়। মোগল উদ্যান দেখে অভ্যস্ত চক্ষু এতে তৃপ্তি পাবে না। কিন্তু সে সব বস্তু অসামান্য—সামান্যদের সমান ভাবে উপভোগের জন্য তো তৈরী হয় নি। হাইড পার্কে যেখানে রাজা স্বয়ং ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছেন তার পাশ দিয়েই সার্পেন্টাইনে এক শিলিং-এর খদ্দের সাধারণ লোক নৌকা বাইছে। তার পাড়ে কত ছেলেমেয়ের খেলা, ভিড়ে বক্তৃতা-বাগীশের মেলা ও দূরে তারুণ্যের লীলা। জলে কটি হাঁস ভাসছে, তাদের খাওয়াতে গিয়ে একটি খুকি তার রুমালটি খুইয়ে বসল। অমনি একজন পুলিস এসে তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে দিল। ইতিমধ্যে তাতে কারো হৃৎস্পন্দন ভয়ে দ্রুত, চরণ পলায়নে চলনশীল হয়ে উঠল না।

পুলিস হচ্ছে লণ্ডনের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য; শালপ্রাংশু সে পথের সবাইকে আশ্রয় দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে; আর সবাই তাকে সাহায্য করবার আশ্বাস দিচ্ছে সতত, এমনকি পথের ভিড়েও। এও হচ্ছে এদেশের একটা প্রধান গুণ।

পাঁচটা ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যে-যার বাড়িতে ছুটবে। হয়তো রাত্রে কারো সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো নাচ বা থিয়েটার আছে, আর কিছু না থাকুক নীড়ের বা ক্লাবের টান তো আছেই। সে বিরাট জনতার মধ্যে গতির প্রাচুর্য আছে, প্রাবল্য নেই। তাড়াতাড়ি সকলেরই আছে, তাড়াহুড়ো নেই কারো। শৃঙ্খলা সবাই মেনে চলে, কারণ শৃঙ্খলা তাদের পথের বন্ধু, পায়ের শৃঙ্খল নয়, গতির বন্ধন নয়।

২

লণ্ডনের লোক এই ত্রিশের দশকে কবিতা পড়ে না। জীবনে রোম্যান্স আছে কিছু, কিন্তু তা কাব্যের ধার ধারে না। গত যুদ্ধের প্রভাব এখন আর চোখে বাজে না; কিন্তু তার শিক্ষা এরা ভোলে নি। ঘোর আশানাশ ও স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে এখনো এদের জীবন যাচ্ছে। যারা প্রৌঢ় তারা যুদ্ধ দেখেছে, যারা যুবক তারা বাবার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছে। চারদিকে ত্রাসের আভাস দেখে কচি মুখ শুকিয়ে গেছে কতবার। মাথার উপর মৃত্যুর রথচক্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছে বার বার। আর দেখেছে ইংলণ্ডের পরিবারভঙ্গের পরিণতি।

লণ্ডনে 'ফ্যামিলি' খুব কম ; 'হোম' আরও কম। সামাজিক রীতিনীতি বন্ধন সব যেন আধুনিকতার বন্যাস্রোতের মুখে একে একে ভেসে গেছে। তার ফলে ঘরকে পর করে পুরুষ বেরিয়েছে একা ; নীড় থেকে নারী এসেছে বাহিরে একাকিনী। পুরুষের হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র বেড়ে গেছে অনেক, আর নারী হয়েছে সাহসিনী। সে আর পুরুষের কাছে অর্ধেক সৃষ্টি অর্ধেক কল্পনা নয়। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সে জীবিকা-অর্জনেও, তাই তার পৃথক সম্মানের আসন-টুকুও প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে সসম্মানে লোপ পেয়ে গেছে। এখন আর কেউ তাকে বাসে বা ট্রেনে মাথা ঝুঁকিয়ে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে না ; সে-ও তা চায় না। সে চায় পুরুষের কাছে সমান ব্যবহার। সে হচ্ছে সহকর্মিণী, সহধর্মিণী হওয়া তার কাছে আজ বড় কথা নয়। সে হচ্ছে আগে কমরেড, পরে কামিনী।

নারী হারিয়েছে তার লালিত্য, যদিও যৌবনের লাবণ্য তার বেড়েই গিয়েছে। সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তার মধ্যে খেলায়, ব্যায়ামে ও নানাভাবে প্রাণ স্ফূর্তি পেয়েছে। কিন্তু প্রাণপ্রিয়া মূর্তি নিয়ে উঠতে পারছে না। তাই সে আর বিপুল রহস্যের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নেই। সে হচ্ছে তবু নারী, কবিতার নায়িকা সে নয়।

আধুনিক কবি কবিতায় স্কুল ও ইউনিভারসিটির দানের প্রতি সম্মান দেখাবে, শ্যামল দেশে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে উল্লাস তার কথা, শিল্পকলার, সাহচর্যের কথা লিখবে। কিন্তু গৃহ ও একনিষ্ঠ প্রেম কবিতার উপজীব্য হিসাবে প্রায় অচল হয়ে একমাত্র চলচ্চিত্রের পর্দাতেই চলমান হয়ে রয়েছে। কবিতা গৃহকে ছেড়ে দেশকে ধরেছে, স্থানীয় ভূমিখণ্ডটুকুকেও আশ্রয় করেছে। বন্ধুদের সঙ্গ, জীবনের আসক্তি খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। Loyaltyর চেয়ে বড় কথা আর নাই। কিন্তু নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের বেলায় তা তেমন প্রবল নয়।

পথে পথে যে জনস্রোত ভেসে যেতে দেখি—চিন্তাহীন, আত্মগত, কর্মব্যস্ত যে জনস্রোত আমায় সকাল-সন্ধ্যায় প্রাত্যহিক প্রবাহের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় তার মধ্যে লণ্ডনের মনের কথার কোন ছাপ পাই না। তবু সে-কথা কত কবিতায়, গানে, কথাসাহিত্যে সহজ ছন্দে ও বিচিত্র বিকাশে রূপ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজপথ এখানে শুধু গতিপথ হয়েই শেষ হয়েছে বলে কখনো মনে হয় না।

মনে হয় এই নিরাসক্ত অথচ কর্মব্যস্ত নগরে কেবল বেঁচে থাকাও কম সুখের নয়। এখানে শুধু পুঁথিগত অধ্যয়নে দিন কাটাচ্ছি না, মনের বাতায়ন খুলে গেছে আর নীরবে অথচ নির্নিমেষে মানুষ-পুঁথি পড়ে যাচ্ছি। সেই কাজটিতে কখন অলক্ষিতে আবিষ্কার করেছি যে, এই সারা জীবন ধরে দিনগত পাপক্ষয় আর বিনাশ্রমের সময়টুকুতে সিনেমা, ফুটবল ও দূর থেকে জানলা থেকে জিনিস দেখে বেড়ানোর বাইরেও লণ্ডনবাসীর মানসিক ঐশ্বর্য ও সবলতা কম নয়।

জীবনের কানন-ভূমিতে তোমার হাসি বা অশ্রুভরা আনন কোন প্রভাব বিস্তার করে যাবে না। তোমার অভাবও হয়তো কারো হৃদয়সরসীতে বিচ্ছেদের কালো ছায়া না ফেলতে পারে। তবু একথা সত্য যে জুন মাস যখন তার সব শোভা ও সৌরভ নিয়ে শহরে মায়াজাল বুনবে, তখন তুমি যেখানেই থাক তোমার জীবন বিফলে কাটছে বলে তুমি মনে করবে না। আবছায়া নীলাভ প্রভাতে লার্ক পাখি জানলার পাশে এসে তোমায় ডেকে যাবে। সুরভিত মুকুলগন্ধ অসহ আকুলতা জাগিয়ে তুলবে। মনে হবে ধৈর্যহারা ধরণী তোমারই জন্য সুন্দরী হয়ে সেজেছে। তুমিও সার্থকভাবে বেঁচে আছ।

একদিন যে সামান্য নাগরিক হয়তো ভেবেছিল—

She singeth and I do make her a song
And read sweet poems the whole day long
Unseen as we lie in our hay-built home

সে যে এই আকর্ষণে বা এই বিরাট নগর ও জীবনের বিপুল বিকাশ ও বিলাস-বৈভবের মধ্যে নিজেকে ভুলে থাকবে বা কাজ করে যাওয়ার মধ্যেই মেতে থাকবে তা মোটেই নয়। সেও ইতিহাসে লিখে রাখবার মত আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই লণ্ডনের অধিবাসীরাই বিশ্বময় যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছিল এবং আবার আয়োজন হলে ভবিষ্যতেও দেখা যাবে যে, যে ভালবাসা কোন প্রশ্ন বা প্রতারণা করে না। প্রতিশ্রুতি বা প্রতিদান চায় না সে ভালবাসা আধুনিক ইংরেজী কবিতাতে যে রকম দেখা যায় ঠিক সে রকম ভাবেই, সব কিছু ছেড়ে দেশকে আশ্রয় করে চরম ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে।

লণ্ডনের মনে শাশ্বত শান্তির বিশেষ আভাস নেই। অনেকটা সেজন্যই বোধহয় যুদ্ধের রূঢ় আঘাতের পর থেকে এরা আরো বেশী করে দেশের ও

শান্তিবাদের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে। কখনো অতীত গৌরবের কথা, কখনো বা ভাবীকালের সংশয়ের কথা ভাবছে। কিন্তু নিরাশার কথা কোথাও নেই।

নরনারীর প্রেমকল্পনার সিংহাসন থেকে নেমে এসে বাস্তব জীবনে যা হতে পারে সেই সম্ভাবনার মধ্যে কখনো বিহ্বল কখনো বিফল বাসনায় আসন পেতেছে। তাই ছাড়াছাড়ি যদি হয় তার মধ্যে থাকে শুধু সহনশীল শালীনতা, থাকে না ক্লান্ত অন্তরের অসুন্দর কাড়াকাড়ি। যৌবনের উত্তপ্ত অনুরাগসিক্ত রক্ত বীরের মত অকাতরে ঢেলে দিয়ে এরা ভাবতে পারে যে, বিদেশের যুদ্ধপ্রান্তরের একটি কোনাকে চিরতরে আমার দেশ করে দিয়ে গেলাম।

এরাই ক্ষণিকের খেয়াল খেলার মধ্য দিয়েও একথা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে জীবনের অলক্ষ্য আঁধার দিয়ে আমার হৃদয়স্রোত এমনভাবে বয়ে যাবে যে মরণকে ফাঁকি দিয়ে যাব, যে আমার রাত্রি এমন একটি তারার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে আর সব লোকের সকল সূর্যের জ্যোতি তাতে ম্লান হয়ে যাবে। ইয়োরোপীয় যৌবনের এই উদ্দাম ধারা কাউকে কোথাও সহজে স্থিতি নিতে দেয় না।

"জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।"

ব্যথা যদি বা পেল, কেন পেল তার বিচার করতে গিয়ে অযথা বিকার বা বিরক্তি এরা প্রকাশ করবে না। এমন কি বিচ্ছিন্না প্রেয়সীর নাম হঠাৎ আচমকা অন্য কেউ উচ্চারণ করলে মনে করবে যে একটি বাহিরের, সুদূরের ছায়া ভেসে এসে চলে গেল, যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ, যার মধ্যে কোন কায়ার মায়া কখনো বুঝি ছিল না।

পুরুষ ও নারী যদি পরস্পর থেকে এত স্বাধীন ও সুদূর হয়ে যায়—জীবিকার প্রয়োজনে বা জীবনের আহ্বানে—প্রেমের কবিতার প্রয়োজনও কমে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর একনিষ্ঠ বা 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' প্রেম অনুভব করা ফ্ল্যাপারদের কাছে কেবল ভাবাবেগের বাষ্পময় সেন্টিমেন্টালিটি বলেই গণ্য হবে। টেনিসনের আদর্শ একালের জন্য নয়, ব্রাউনিং-এরও একটা দিক সম্পূর্ণ অচল।

যার প্রতি ইহজীবনে প্রেম নিবেদন করা ঘটে ওঠে নি, সেই মৃতা প্রেয়সীর হাতের মুঠোর মধ্যে একটি পাতা রেখে জন্মজন্মান্তরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনদিন তাকে লাভ করবে এ বিশ্বাসে একালের প্রেমিক সান্ত্বনা পাবে না। ইহলোকের উপরই যার দাবি দৃঢ় নয়, অন্য কোন ভাবী জন্মের উপর তার ভরসা থাকবে কেমন করে?

"That it fades from kiss to kiss" একথা যে জেনেছে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে বহু। তার হৃদয় তাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল ও অনেকনিষ্ঠ। পথে পথে কত নব পরিচয়, নব অনুভব, স্মৃতির পথ বেয়ে কত মূর্তির আনাগোনা। তার মধ্যে কোন্‌টি প্রতিমা হয়ে পূজা পাবে তার ঠিক কি? আর তার বিসর্জনের সময় আসবার আগেই অন্য মূর্তির ছায়া এসে পড়তে পারে। হয়তো একটি আগেরটির চরণচিহ্ন পর্যন্ত মুছে লোপ করে দিল, কারণ স্মৃতি তো প্রীতির আসন জুড়ে বসে থাকতে পারে না।

জীবন্ত এরা চায় জীবন্ত প্রেম। স্মৃতি হিমশীতল, তার মধ্যে প্রাণময়তার কবোষ্ণ স্পর্শ, নিশ্বাস-সুরভি নেই। কাল যা ছিল তা আজ নেই বলে যে কাঁদতে হবে চিরকাল তার কি মানে আছে? নূতন এসে সে ব্যথায় প্রলেপ দিয়ে শূন্যকে পূর্ণ করে তুলবে। আগেকার চরণচিহ্ন মুছে লোপ করে দেবে। কিন্তু নূতনও তো না টিকতে পারে? সে অবস্থায় কাকে মর্মের মন্দিরতলে অনন্ত জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়?

এ হচ্ছে হিরাক্লিটাসের দর্শনবাদের যুগ। এই মুহূর্তে নদীর যে জলবিন্দুটি এখানে আছে, পরমুহূর্তে ঠিক সেটুকু আর নেই। কিন্তু দুটি বিন্দুই একটি আরেকটির চেয়ে কম সত্য নয়। নবীনা কারো সঙ্গে দেখা হল "পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা রাতে"। তার আকর্ষণে স্মৃতিতে টান পড়ল, পুরাতনার কথা মনে হল। সে কোন্‌দিন বলে গেছে তার প্রেমকে গাছের ডালে পাতার মত সহজভাবে নিতে। সে কোন্‌দিন বলেছে আঁধার রাতে তারা দুটি তরণী আলো ফেলতে ফেলতে মন বিনিময় করে কোন দিন হয়তো অন্তরালে মিলিয়ে যেতে পারে।

সে-সব স্মৃতি ও চিন্তার স্রোতে টলমল করতে করতে কোথায় হয়তো পুরাতনার আসন নবীনার আহ্বানের কাছে হার মেনে ভেসে যাবে তার ঠিক নেই।

বিশেষ করে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কল্যাণে দুয়োরানী-সুয়োরানীর পালা উঠে গেছে। তোমার বরমাল্যের সব কটি ফুল আমায় দাও, তার মধ্যে কোন ভাগাভাগি সহ্য হবে না। তোমার হৃদয়াকাশে আমি একটি চন্দ্র হয়ে বিরাজ করব, কোন ম্লান তারকারও সেখানে ঠাঁই হবে না। আমার স্বতন্ত্র সত্তা একটুও ক্ষুণ্ন যেন না হয়। এসব আদর্শ নিয়ে কিন্তু আধুনিকার জ্বালা কম নয়। স্বাধীনতার কল্যাণে না টিকল তার ঘর, না জুটল বর, না ঘটবে হয়তো জীবনে প্রিয়তমের আবির্ভাব। তাই সে জীবনকে যেমন লঘুভাবে গ্রহণ করছে তেমনি একবার আঘাত পেলেই নুয়ে পড়ে না, অশ্রু মুছে জীবন নূতন অধ্যায় আরম্ভ করে।

তবে কি এইরকম প্রেমধারায় কোন তত্ত্ব নেই। তা ভাবলে ইয়োরোপের যৌবনকে ভুল বোঝা হবে। এদের মন্ত্র কবির ভাষায় বলতে গেলে—

I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion

* * * * *

ইংরেজ চরিত্রের হিসাব এত সহজে দেওয়া যায় না। তার দেহ যেমন বিশাল, তার হৃদয়ও তেমন গভীর। সে কথা কয় কম, আলাপ করে আরো কম, আর হৃদয়ের অনুভব বাইরে প্রকাশ করতে চায় না। চিত্তের সুখে মত্ত আত্মপ্রসাদে ভরা যার দিনগুলি বর্ষার গঙ্গায় উৎসর্গ-করা ফুলের মত স্বচ্ছন্দে ভেসে যাচ্ছে বলে মনে করছি. একটা দুর্লভ মুহূর্তে একটা আন্তরিক সহানুভূতির কথাতে হয়তো তার নূতন একটা বেদনাভরা স্বরূপ ধরা পড়ে যাবে। শৈলসম অচপল প্রেম এত গভীরভাবে কি করে লুকানো থাকে ?

জনবুলের চরিত্র বিচিত্র। একটি অধ্যাপককে পুস্তক-কীট বলেই জানতাম। জনবুলের দেশের মাটিতে তার রুক্ষ মনটি পুরানো বটগাছের ঝুরির মত হাজার দিক দিয়ে শিকড় গেড়ে আছে ও সাগরঘেরা দ্বীপের চরিত্রের সব রকম সম্ভব কোণীয়তা (angularities) যেন তার মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণ ফলার মত উঁকি-ঝুঁকি মারছে। সেই বৃদ্ধকে নিয়ে মনে মনে কতদিন যে ব্যঙ্গচিত্র কল্পনা করেছি তার ঠিক নেই।

সেই তিনি, পয়লা মে সকালবেলা যখন তাঁর সামনের দিকের বাগানে সোনার আলো ফুলের উপর হিল্লোলিত হচ্ছিল আর সেই নির্জন পল্লীতে গাছে গাছে পাখির ডাকে উৎসবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, তখন গোপনে তাঁর বাড়ির পিছনে

ফুলের হাসিতে উচ্ছ্বসিত একটি চেরীগাছের নীচে হাঁটু গেড়ে বসে হাউসম্যানের কবিতা পড়ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ও বার্ধক্যের হাজার রুক্ষতার ছদ্মবেশের ভিতর থেকে একটি কবিপ্রাণের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ চোখের জলে প্রকাশিত হচ্ছিল।

স্পেনের সন্ধানে

১

কাল শেষরাতে শেষ শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার মধ্যে বোর্দো থেকে হিস্পানীদের গান শুনতে শুনতে পীরেনীজ পর্বতমালার ইরুন গিরিবর্ত্মে এসেছি। এই গান খুব পরিচিত মনে হল।

দু-মাস ইংলণ্ডের শীতের জড়তার মধ্যে এতটা সহৃদয়তা, এতটা আকর্ষণ পাই নি। লণ্ডনের কন্সার্ট হলের কঠিন শীলতা ও আচারনিষ্ঠা প্রথম প্রথম বিদেশীকে অভয় দিতে পারে নি। কিন্তু কাল রাতে পার্বত্য হিস্পানীদের গান আমাদের রাখালদের গানের মত জ্যোৎস্নার আভাসে ভরা আকাশে মিলিয়ে গিয়ে আমায় আশ্বাস দিচ্ছিল। তাই শেষরাতে সীমান্তের স্টেশনে অপরিচিত গ্রাম্য ও পার্বত্য লোকগুলির দুর্বোধ্য ভাষা সত্ত্বেও স্পেনকে বিশ্বাস করে হৃদয়ে বরণ করে নিলাম।

আলো, আলো! কত মাস পরে জীবনের সাড়া পেলাম বলে মনে হল। ইংলণ্ডের ম্লান মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশেরও একটা রূপ আছে। সে রূপ উপভোগ করতে হলে বহু ধৈর্য ধরে ইংলণ্ডের ঘোমটা তুলে ধরতে হবে। কুয়াশায় পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে অজানার সন্ধানের আনন্দ পেতে হবে। 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে' সময়মত কলেজে না গিয়ে শীতের সকালে বাসে চড়ে রক্তসূর্যের হরিদ্রাভ অপমান দেখতে দেখতে দেরি করে ফেলে এমনকি ক্লাস কামাই করেও বিষণ্ণ ভাব দূর করে ফেলতে হবে। রাতে বিজলী বাতি বা জ্যোৎস্নার আলোয় স্কেটিং করতে হবে দূর প্রান্তরে।

সব মানি, মানি যে অন্ধকারের আড়ালে আকাশ ও পৃথিবীর যুগল তপস্যার মধ্যে একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য আছে; কিন্তু ইংলণ্ডের ভূখণ্ডটিতে তার মধ্যে একটা ক্লান্তির চিহ্ন কোথায় যেন ধরা পড়ে। তাই স্পেনের আলো আমার কাছে জীবন এনে দিল।

পীরেনীজ শৈলমালার কয়েকটা চূড়াতে একটা নীল আভা মূর্ছিত হয়ে রয়েছে। যেন নিশান্তের সুখস্বপ্নের আবছায়া স্মৃতিখানি। কত যুগ এমন স্নিগ্ধ নীল আলোয় ভরা উষার মোহন রূপ দেখি নি। আজ প্রথম কৈশোরের

আরবের মত একটা অকারণ আনন্দ মনকে মাতিয়ে তুলল। পরীক্ষার চিন্তায় ভারী মন নয়, আকাশের পাখির মত লঘু সরল মন নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। উষা যে নিশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে প্রভাতের জাগরণের ভাষা শুনতে শুনতে মৃদু চরণক্ষেপে এখনই চলে যাবে। পথে ঘাটে শীতকাতর হিস্পানী কম্বলে-মোড়া অবস্থায় জড়সড় হয়ে চলেছে। একটা গাধা রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। একটা ছোট ঘোড়ায়-টানা গাড়ি অনর্থক দাঁড়িয়ে আছে। একটা দোকানের সামনে খানিকটা কাদা, জল দিয়ে সে জায়গাটা পরিষ্কার করবার গড়িমসি চেষ্টা হচ্ছে।

লণ্ডনের প্রভাতের চাকরানীর কর্মব্যস্ততা, দুধওয়ালার ক্ষিপ্রপদে দ্বারে দ্বারে দুধ রেখে যাওয়া, কুলি-মজুরের 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' বা ট্রামের পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো, এ সব পেলাম না, তাই পথগুলি বড় খালি মনে হতে লাগল।

হঠাৎ দেশের কথা মনে পড়ল। আবার ইংলণ্ডে নূতন-পাওয়া উল্লাসের প্রাচুর্যের কথাও ভাবলাম। বুঝলাম ইংলণ্ডের শিক্ষার ফল আমার উপর ফলছে। তাই সে দেশের কাজে-পাগল, চঞ্চল, সফল জীবনের স্পর্শ পেয়ে এত ভাল লাগে।

মনের মধ্যে রোদের উত্তাপ অনুভব করতে পারছি। ইংলণ্ডেও এই উত্তাপ দেখেছি। যেদিন একটু সূর্যের আলো অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেয় অমনি দলে দলে লোক শহরের বাইরে চলে যায়, ছেলেরা খেলতে যায়, লণ্ডনের মাঠগুলি সূর্যোপাসকের দলে ভরে যায়। লণ্ডন কলকাতা নয়। সেখানে প্রত্যেক পাড়ায় নিশ্বাস ফেলবার ও আরামে বেড়াবার বাগান আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা অত বড় কর্মচঞ্চল, গতিময় শহরও ভোলে নি।

শুধু ধনী লণ্ডনই বা কেন? ছোট শহর ও গ্রামগুলিতেও সেকথা সবাই মনে রাখে। গ্রামটিকে ও তার চারিপাশকে সাজিয়ে রাখবার কত ইচ্ছা ও চেষ্টা! আমার চোখ নিশ্চয়ই এখনো ইয়োরোপীয় হয়ে যায় নি। কিন্তু গ্রাম্য ইয়োরোপের পাশে গ্রাম্য বাংলাকে দাঁড় করিয়ে অনেকবার মনে হয়েছে যে, আমাদের দেশের কবিরা নিছক সত্য কথা লেখেন নি। তাই বাংলার রূপ যতটা পাই কবিতায় ও কল্পনায়, ততটা জীবনে পাই না। মনে বাংলার রূপের পরশ যতটা বেশী থাকা উচিত ছিল ততটা হয়তো নেই। এ-কথা কি করে অস্বীকার করব যে, মনের মধ্যে গ্রামের যে সুন্দর, প্রাণময়, লীলায়িত আনন্দঘন ছবি

আঁকা ছিল, তার সঙ্গে দেখলাম বাংলার গ্রামের চেয়ে ঔপন্যাসিক হার্ডির গ্রামগুলিই বেশী মিলে গেল।

২

ভারতবর্ষে ধারণা আছে স্পেন হচ্ছে ইয়োরোপের মধ্যে এক টুকরা ভারতবর্ষ। সে-কথাটা পরীক্ষা করবার ইচ্ছা বার বার জেগে উঠেছে। পীরেনীজের পার্বত্য অঞ্চলে ও অন্যান্য ছোট শহরে উত্তর ইয়োরোপের কর্মচঞ্চলতা বা উৎসাহের প্রাচুর্য পেলাম না।

স্পেন ও ফ্রান্সের মাঝখানে এণ্ডোরা নামে যে রাজ্যটুকু আছে সেখানেও এই অবস্থা। পথে ঘাটে গতির আরাম আছে, আবেগ নেই। নগরবাসিনীর মৃদুমন্দ গমনে লাবণ্য আছে, লীলা নেই। লণ্ডনের জনতাপূর্ণ পথে কিন্তু মনে হয়েছিল যে, ইংলণ্ডে সবাই নিয়ম মেনে চলে, কারণ পথের শৃঙ্খলা সে দেশে কারও পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজে না, লক্ষ লোকের চলাচলের মধ্যে তা বন্ধুমাত্র, বন্ধন নয়।

স্পেনের গ্রাম্য পোশাকও ঠিক ইয়োরোপীয় ছাঁদের নয়। ইয়োরোপীয় পোশাকের স্বষ্ঠু ভাব এখানে আশা করা যায় না। মেয়েদের পিঠে সুন্দর ঝালর দেওয়া শাল,—রেশমী শালে-জড়ানো পোশাক ভারি সুন্দর দেখায়। পুরুষদের মাথার ক্যাপগুলিতে বিশেষত্ব আছে। এদেশে মূররা বহু শতাব্দী (পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত) রাজত্ব করে গিয়েছে। তাদের ও ইহুদীদের রক্তসংমিশ্রণ দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালের আগে বহু পরিমাণে হয়েছে। তার ফল হাবভাবে, চেহারায় ও চরিত্রেও যথেষ্ট দেখতে পাই।

স্প্যানিশ লোকের গড়ন কিছু মোটা ও ছোট, রঙ অলিভ, অর্থাৎ উত্তর-ইয়োরোপের লোকের মত অত সাদা নয়; চোখের কটাক্ষ গভীর ও কাজল, ভ্রূভঙ্গীতে একটা প্রাচ্য আভাস। লোকগুলি সহজে পথের দেখায় বন্ধুত্ব পাতায়, মন খুলে গল্প করে, আবার হঠাৎ ধৈর্য ও শান্তি হারায়। অনেকটা সুয়েজের এ-পারের মত আবহাওয়া।

একবার পথে বেরিয়ে একটি ঘণ্টার মধ্যে নূতন আলাপ ও নিবিড় বন্ধুত্ব এবং তুমুল ঝগড়া ও ভীষণ শত্রুতা পথেই হচ্ছে দেখে এলাম। প্রকৃতিই মানুষ গড়ে; রৌদ্র ও শীত চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার উপর বিদেশী মূরের অধীনতায় বহুদিন বাস করায় জাতীয় চরিত্রও বদলিয়েছে। ইতিহাস

দেখিয়েছে যে, স্বাধীন হবার পর বিদেশী প্রভাবের ফল দূর করার জন্য স্পেন প্রবল চেষ্টা করেছে। স্পেন মুর ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন যুদ্ধ চালিয়েছে। ইয়োরোপের ধর্ম ও রাজনীতির নেতা ও বিধর্মী তুর্কীর বিরুদ্ধে রক্ষাকর্তা হয়েছে। সেই যুগে স্পেন একই কালে সমস্ত ইয়োরোপে ও বাইরের জগতেও সৈন্য পাঠিয়েছে। ধর্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার করেছে বীরত্বের আবরণে।

তবু স্পেন পুরোপুরি ইয়োরোপীয় হতে পারে নি। তার রাজনীতির অবনতি, অভিজাত দলের পতন আর অত্যাচারের ফলে অধীন প্রজার বিদ্রোহ ঠিক প্রাচ্যভাবেই হয়েছে। ইয়োরোপ বলতে যা বুঝি স্পেন তার সবটা আমাদের দিতে পারে না।

তাই যখন এই প্রাচ্যভাবাপন্ন পোশাক-পরা হিস্পানীদের মধ্যে একটি মেয়েকে নিখুঁত হাল-ফ্যাশানের পোশাকে দেখলাম তখন তার দিকে একটু বিস্ময়েই না তাকিয়ে পারলাম না।

পাহাড়ের উপর তখন রৌদ্র ছায়া ও নীলাঞ্জন একটা অপূর্ব মোহ ছড়িয়ে রেখেছে। অস্তরশ্মিতে উদ্ভাসিত বেলাশেষের আকাশের সব ঐশ্বর্য তখন ইরুন থেকে সান সিবাস্টিয়ানের পথে একটি হ্রদের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই আসন্ন অন্ধকারের মোহিনী মায়ার মধ্যে বুঝলাম যে, এই মেয়েটি জাতিতে হিস্পানী কিন্তু আমারই মত ভ্রমণপর। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু শোভনা। সে যা কিছুতে হাত দেবে তারই মধ্যে একটা সুকুমার কান্তি জেগে উঠবে। কালিদাস তার লীলাচঞ্চলতা দেখে তাকে বনহরিণীর সঙ্গে তুলনা করতেন। অথচ প্রতি রক্তকণায় সে নগরবাসিনী। তার ভাল লাগা বলে কোন জিনিস নেই। ভাল লাগলে হৃদয় থেকে সেই ভাব প্রকাশ কেমন করে হতে পারে তা সে ভুলে গেছে। এই শ্রেণীর নারী নিজের বাইরে আর কারও কথা সহজভাবে ভাবতে পারে না।

আমার মনে হয়, ইয়োরোপের অবাধ মেলামেশার সমাজে, সকলের স্তুতিবাদ শুনতে শুনতে ক্লান্ত রূপকে এই মূল্য দিতেই হবে। যদিও মেয়েটি রঙীন আকাশের তলায় ধূসর পাহাড়ের একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য দেখে বলে উঠছে, "কি সুন্দর, নয় কি", যদিও সে এই লোকগুলির অদ্ভুত পোশাক ও মনোহর চলনভঙ্গী, দেখে মৃদুস্বরে বলছে, "কি অদ্ভুত, চমৎকার" তবু জানি যে সে সেই বিরাট ও স্তব্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে একটু বাইরের জগতের বলে মনে করছে। সে এই

নিরুদ্দেশের আহ্বানময় দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি, আর সেজন্য এই উদাস বৈরাগ্যের ধূসর চিত্রপটের সামনে তার উজ্জ্বল পোশাক, ফ্যাশানের চূড়ান্ত একটা স্কার্টের পকেটে হাত রেখে অঙ্গ হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা প্রতিবাদের মত দেখাচ্ছে। সে যেন বুলভার-এ বেড়াতে এসেছে, সে পথিক নয়। তার চরিত্র হচ্ছে আত্ম সচেতন, তার মনের জন্মভূমি প্যারিসের এক টুকরা, জীবনের মানদণ্ড ফ্যাশান।

যেখানেই যাই এই রকম টুরিস্টের সন্ধান পাই। 'আমেরিকান টুরিস্ট' কথাটা একটা হালকা হাসির কথা হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু আমেরিকানরাই বা দোষী কেন? বেশীর ভাগই বাইরে বেড়াতে আসে ক্লাবে ও সমাজে নাম কিনবার জন্য, দলের মধ্যে দশ রকম কথা বলতে পারবার জন্য। সবাই 'টুরিস্ট এজেন্সি'র বিজ্ঞাপন ও 'গাইডে'র হাতে আত্মসমর্পণ করে বিনা প্রতিবাদে চোখ না খুলেই। বিখ্যাত চিত্রশালা ও জন্তুশালা, রাজপ্রাসাদ ও ভূতুড়ে দুর্গ দেখে বড় হোটেলের বাঁধা ভোজ খেযে নিজের দলের বা সেই হোটেলের অন্যান্য ভ্রমণকারীর সঙ্গে থেকে নির্ভাবনায় সময কাটিয়ে যায়। ইংরেজ ও আমেরিকান সব সময়ই ইংরেজী কথা বলা যায় এমন হোটেলে আস্তানা নেবে।

এ বিষয়ে বিদেশী সামান্যবিত্ত ছাত্র সৌভাগ্যবান্। সে থাকবে দেশীয় হোটেলে বা কোন লোকের বাড়িতে সামান্য কাঞ্চন-মূল্যে। ভোজন তার নিজে আবিষ্কার-করা পথের পাশে রেস্তোরাঁয়, পরিচয় অপরিচিতের সঙ্গে। আর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য যে সে নিজেকে ভুলতে বা ভোলাতে দেশভ্রমণে আসে না, আসে নিজেকে জাগাতে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার পথের লোক অন্য কোন কারণে না হলেও একটা বিশেষ মানসিক কারণে ভ্রমণকারী হতে বাধ্য। তারা নিজেদের ভুলতে চায়। সৌভাগ্যের অনিত্যতা, জীবনের লক্ষ্যহীনতা ও অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবুদ্ধিতা তাদের জীবনকে একটা উদ্দেশ্যহীন অনিবার গতি দেয়! সেই গতির আবেগে এরা মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়।

স্পেনের শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-বিলাসের স্থান সান্ সিবাস্টিয়ানে বিস্কে উপসাগরের ব্রেক-ওয়াটারের পিছনে সাগরস্নান করতে করতে এই কথাই মনে হল। সামনে সমুদ্রের অসীম নীল নিদ্রাকরুণতা, দুই পাশে আসামের মত বিটপীশোভিত পর্বতশ্রেণীর শ্যামশান্তি। এই দৃশ্যের মধ্যে তো ভ্রমণকারীর দল নিজেদের

মিলিয়ে দেয় না। কেউ হৈ-চৈ করে সমুদ্রস্নান করে, কেউ স্পেনের চমৎকার মোটর-পথে বহুদূর চলে যায়, কেউ সন্ধ্যায় হোটেলের বিস্তীর্ণ বিলাসলীলাময় নাচঘরে আত্মবিস্মৃত থাকে। আত্মবিস্মরণের এই প্রাণপণ চেষ্টাই তাদের অনেকের উদ্দেশ্যহীন জীবনের উদ্দেশ্য। নিজেকে বিস্মৃত হবার, চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করবার প্রবল তৃষ্ণায় তারা আনন্দের পর আনন্দের সম্ভারে দিনরাত্রি ভরে রাখতে চায়।

আজকাল উল্লাস ও উত্তেজনা না হলে চলে না, কারণ সকলেই গত মহাযুদ্ধের পর থেকে নিজের অসহায় ক্ষুদ্রতার কথা ভাবতে ভয় পায়। যা অনন্ত ও চিরন্তন তা এ-যুগে ইয়োরোপে সান্ত ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন আশ্বাসের বাণী দিতে পারছে না। কিন্তু এ আনন্দের সন্ধানও কাউকে বেশিদিন তৃপ্ত রাখতে পারছে না, কারণ তা লঘু, অগভীর ও বিরামহীন। ইয়োরোপের সব আনন্দের পণ্যশালাতেই একটা অতৃপ্তির ভাব দেখি যাকে ফরাসী ভাষায় বলে 'blase'। যাদের জীবনে এত গতি, এত উদ্দামতা, তারা নির্জন মুহূর্তে বলে ওঠে—হাউ বোরিং!

৩

ডিসেম্বর মাসের প্রভাত বাইরের বরফের প্রতিফলিত আলোতে উজ্জ্বল, কিন্তু নানা রঙে আঁকা কাঁচের মধ্য দিয়ে অতি সামান্য একটু আলো সালামাঙ্কার প্রাচীন বিরাট গীর্জার মর্মর-স্তম্ভের অন্তরালে ক্রুশের উপর মূর্ছিত হয়ে রয়েছে। এই গীর্জায় মূরীয়, বাইজেন্টাইন ও গথিক—তিন রকম শিল্পধারার যে অতুলনীয় সমাবেশ ও ক্রমবিকাশের উদাহরণ রয়েছে তা থেকে কিন্তু আমার দৃষ্টি অন্যদিকে আসতে বাধ্য হল।

আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে আপাদমস্তক কালো পোশাকে আবৃত একটি নতজানু, ধ্যানরত হিস্পানীকে দেখছিলাম ও মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলাম যে খ্রীষ্টধর্ম পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের দান। এই দৃশ্য তো এতদিনেও ইয়োরোপে ধর্মমন্দির ছাড়া আর কোথাও দেখলাম না। এ যেন আমাদের অতি-চেনা, এর সঙ্গে অন্তরের পরিচয় আছে। যে ভূমিখণ্ডে এই পূজারী রয়েছে সে যেন ইয়োরোপের মধ্যে

প্রাচ্যের এক টুকরা। প্রতীচ্যের অন্ধ গতিবেগ, শান্ত ও কলহায়ীর প্রতি অনুরাগকে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবই প্রাচ্যের স্বভাবসুলভ ধ্যানের স্থিতিশীলতা দিয়ে সংহত করে রেখেছে ; চিত্তবিক্ষেপ থেকে সমাধি, বিষয় থেকে আদর্শ, আত্মবিস্মরণ থেকে মননে ফিরিয়ে এনেছে।

সালামাঙ্কা প্রাচীন স্পেনের একটি অক্ষুণ্ণ পরিপূর্ণ চিত্র। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান কালের উপযোগী করে তুলবার চেষ্টা এই শহরটির মাধুর্য নষ্ট করে দেয় নি। যে-যুগে গ্যালিলিওর আবিষ্কার ইয়োরোপের আর কোথাও স্বীকৃত না হলেও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে বা কলম্বসের অদ্ভুত নূতন আবিষ্কারের কাহিনী শুনতে দশ হাজার ছাত্র আঁকা-বাঁকা গলি-পথ দিয়ে যাতায়াত করত, সে-যুগ এখনও এখান থেকে একেবারে চলে যায় নি।

শঙ্খগৃহের (Casa de las Conchas) বনিয়াদী ঘরোয়া প্রথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কারুকার্যের উপর বিংশ শতাব্দীর কোন ছাপ এখনও পড়ে নি। মধ্য যুগের রঙীন চামড়ার শৌখীন হাতের কাগজের শিল্পে সালামাঙ্কা বর্তমান ভেনিসের চেয়ে বড় ছিল। কলেজের ছাত্ররা এখনও তাদের বই এই চামড়ার সুদৃশ্য আবরণে ঢেকে রাখে। এখনও পঁচিশটি কলেজের ও ষাটটি মঠের সম্পদ্ হচ্ছে তাদের যত্নরক্ষিত কারুকার্যখচিত পুস্তকাগারগুলি ও বিশেষত ধর্মপুস্তকের বিভাগ।

একটির ভিতর থেকে যেদিকেই তাকাই, বিরাট গীর্জাটিই শুধু চোখে পড়তে লাগল। সমস্ত শহর ছাড়িয়ে, তার সকল সাংসারিক কর্মকে ছাপিয়ে, তার সব আশা ও বিশ্বাস, প্রেরণা ও সাধনাকে মূর্তি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সালামাঙ্কার গীর্জা।

যারা বলছে যে পাশ্চাত্ত্য জাতির ধর্মের প্রয়োজন নেই তারা ঠিক বলছে না। স্পেন রাজা আলফন্সোর পলায়নের পর থেকেই গণতন্ত্র ক্যাথলিক ধর্মকে রাজধর্মের পদ থেকে চ্যুত করেছিল, ক্যাথলিক-পরিচালিত স্কুলগুলি লোপ করে দিয়েছিল, দেবোত্তর ধর্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। তার ফল রাজনীতিক চাঞ্চল্য ও অশান্তির মধ্যে, নব্য স্পেনের সরকারী স্কুলে শিক্ষকের অভাবে, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে বারংবার প্রকাশ পেয়েছিল। স্পেনের গীর্জায় অনেক দোষ ছিল, বৈষয়িকতা তার মধ্যে বহু পরিমাণে ছিল, যাজক হওয়া একটা লাভ-জনক ব্যবসায়ে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম হিস্পানীদের অন্তরে অনেকখানি

স্থান অধিকার করেছিল। ধর্ম বলতে আমি কোন পারলৌকিক মঙ্গলের অনুষ্ঠানমাত্রকেই বলছি না।

ধারণাদ্ ধর্ম ইত্যাহুঃ...যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ সঃ ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

কুশাসিত, বিভক্ত-প্রদেশ, স্থির রাজনীতিহীন স্পেনের বিক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের চিত্তকে ধর্মই একপথে চালিয়ে নিয়েছিল।

যে বৃদ্ধকে আমার সামনে এই প্রাচীন মন্দিরে উপাসনা করতে দেখেছি তার অন্তরের মধ্যে ধর্ম একটি গোপন কোণ জুড়ে রেখেছিল। তার সেই নিভৃতি যখন লোপ পেয়ে যাবে, তার অন্তরের আশ্রয় আর থাকবে না, তখন সে খুব সহজেই বার্সিলোনার ছাত্র-বিপ্লবীদের পর্যায়ে চলে যাবে।

৪

একাধারে মঠ ও মন্দির, প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ হচ্ছে 'এস্কোরিয়াল'। স্পেন ও ক্যাথলিক ধর্মকে যা-কিছু গঠন করেছিল তারই কয়েকটি কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট স্মরণচিহ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে। এ হিসাবে এস্কোরিয়ালের স্থান দিল্লী বা ফতেপুর সিক্রির উপরে।

এই জায়গাটি দিল্লীর মতই একটি বিলুপ্ত যুগের মূক প্রহরী। তার প্রাসাদ আছে, প্রহরী নেই, রাজপ্রেয়সী নেই। কিন্তু দিল্লীর কাছে নূতন দিল্লী হয়েছে। নূতন রাজপুরুষদের পদশব্দে রাজপথ পুনরায় মুখরিত হয়ে উঠেছে, যদিও ওমরাহদের সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। এস্কোরিয়াল ফতেপুর সিক্রির মত অতীত যুগের চিহ্নগুলিকে সগৌরবে বহন করে আসছে; সে যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

এ ধারণাটি সবচেয়ে বদ্ধমূল হয় এখানকার লোকদের সঙ্গে আলাপে। এদের চিন্তা ও স্বপ্ন এখনও মধ্যযুগ ছাড়িয়ে বর্তমানে এসে পৌছায় নি। এখানে কার্লস্ কিন্তো (পঞ্চম চার্লস) ও ফিলিপ সেগুন্দো (দ্বিতীয়) সম্বন্ধে এমনভাবে কথা কয় যেন তারা গতকালের বিদায়-নেওয়া বন্ধু; সিয়েরা গুয়াদারামা পর্বতের নীলাঞ্জন ছায়ায় যেন এখনও তাদের অশ্বখুরের ধুলা মিলিয়ে যায়নি।

এস্কোরিয়ালের সঙ্গে বহির্জগতের কোন সম্বন্ধ নেই। মাদ্রিদ-প্যারিস এক্‌স্‌প্রেসে মাদ্রিদ থেকে মাত্র এক ঘন্টার পাড়ি; কিন্তু মাদ্রিদের কোন জনস্রোতের বা চাঞ্চল্যের ঢেউ এখানে এসে পৌছায় না।

দ্বিতীয় ফিলিপ চেয়েছিলেন যে তাঁর জীবনের ধর্মময় শেষ দিনগুলি শান্তিপূর্ণভাবে এখানে কাটবে। সেই বৃদ্ধ সম্রাটের জীবন বৃহৎ সাম্রাজ্যরক্ষা ও বিস্তৃতির টানাপোড়েনে অশান্তিতে ভরে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের প্রাসাদটি এখনও শান্তিতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখানে সেণ্টদের উৎসবগুলি এখনও ধূলিধূসরিত, কিন্তু আড়ম্বরময় মঠের ভিতর নিয়মিতভাবে পালিত হয়। সেগুলিই এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

সিয়েরা গুয়াদারামার নীল চিত্রপটের সামনে ধূসর, ধূপসুরভিত, উপাসনানন্দিত এই সৌধের চারিদিকে একটা অননুভবনীয় সৌন্দর্য আছে। শহরতলিও এমন চমৎকার মাধুর্যে ভরা। সে মাধুর্য মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসে এখানে রয়ে গিয়েছে। যুবরাজের প্রাসাদের উদ্যানপথে ছোট ছোট ছেলেরা পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ির তৈরি রাস্তায় এমনভাবে আধটি পেসেতা চায় যে তাকে ভিক্ষা বলা চলে না—এ যেন কামাখ্যার পাহাড়ে কুমারীদের পয়সা চাওয়া।

ঐ বিশাল পর্বতের তলায় জলপাইকুঞ্জে যখন ছায়া দীর্ঘতর হয়ে নেমে আসে, যখন রাখালবালক তার ছাগলগুলি নিয়ে ঘরের দিকে ফিরে যায়, গাধার গলায় বাঁধা-ঘণ্টা শ্রান্ত স্বরে বাজতে থাকে, তখন মনে হয় এই মধ্যযুগের শহরটি এখনও পদবী ও আভিজাত্যের মর্যাদায় গর্বিত বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত স্প্যানিশ অভিজাতদের প্রতীক্ষা করছে। তারা সপ্ত সমুদ্রের পারের দুর্গম অজ্ঞাত দেশের ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা আহৃত রত্ন গুয়াদিল কিভার নদীর তীরে সেভিলের বন্দর থেকে নিয়ে সম্রাটকে এই ভোগবিলাসহীন প্রাসাদে অভিবাদন করতে আসবে। চারিদিকের পাথরের বাড়িগুলির জানালা সকৌতুকে উন্মুক্ত করে নাগরিকারা চেয়ে দেখবে। গীতার-বাদ্যরতা কোন তরুণী ব্যাকুলবক্ষে নীচে নেমে এসে তার প্রত্যাশিত বীরের সন্ধানে রত কালো কাজল আঁখি একবার প্রকাশিত করেই সরে যাবে।

মাল্টার কথা মনে পড়ে। সেখানেও এমনি আঁকাবাঁকা রাস্তায় হরিণাক্ষী তরুণীরা চকিতে সরে পড়ে; আর স্থিরাক্ষী গৃহিণীরা কালো রেশমী শালে ঘাড় ঢেকে বিজয়গর্বে চলে যায়। বিদেশী পথিককে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

মঠের বিশাল দক্ষিণ তোরণ যেখানে সর্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, রাজর্ষি ফিলিপের স্মৃতি যেখানে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে বুঝি চপলতার

কল্পনাই এরা করতে চাইবে না। প্যান্থিয়ন বা রাজকবরগৃহের শবাধারগুলির মর্মরের অসম্ভব রকম উজ্জ্বলতা হয়তো আমাদের তাজমহলকে হার মানায়। এখানকার অন্ধকারপ্রায় ভূগৃহে পঞ্চম চার্লস থেকে প্রায় সব রাজারই শেষভস্ম রক্ষিত আছে। শ্মশানের শূন্যতায় নয়, ঐশ্বর্যের পূর্ণতায়। এখানে একটি শবাধার দেখিয়ে গাইড বলল, "এটি রাজা আলফন্সোর জন্য ছিল। কিন্তু খাঁচায় পুরবার আগেই পাখি আমাদের কল্যাণে পালিয়েছে।"

এই রসিকতা করার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখদুটি চকচক করে উঠল ও মর্মর দ্যুতিতে উজ্জ্বল-প্রায় সেই ভূগর্ভে সে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল ও বুকে ক্রুশচিহ্ন অঙ্গুলি দিয়ে এঁকে দিল। মনে মনে বুঝলাম সোশ্যালিজ্‌মের উপরও ধর্মপ্রাণতার জয় হয়েছে।

ইতিহাসের দিক দিয়েও এখানে চিত্তাকর্ষক বস্তুর অভাব নেই। যে বিলাসহীন কক্ষে, যে টেবিলে, যে ঘড়ির সামনে অক্লান্তকর্মী ফিলিপ সাম্রাজ্যের কাজ করতেন তা সবই তেমন ভাবে সাজানো আছে। ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রানী মেরীর বাসরশয্যা ও শয়নকক্ষ এখনও সযত্নে সাজানো আছে। রাজদূতদের আসনগুলি এখনও তাদের প্রতীক্ষা করছে। দ্বিতীয় ফিলিপের পুস্তকাগার এক সময়ে ইয়োরোপে অদ্বিতীয় ছিল। তিনি এর উন্নতির জন্য কম চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেননি। শুধু তাই নয়, চিত্রশিল্পের জন্য তিনি ও তাঁর বংশধরেরা এস্কোরিয়ালের প্রাসাদে অনেক ব্যয় করে গিয়েছেন। তিৎশিয়ান, তিন্তো-রেত্তো ও ভেলাস্‌কেথ প্রভৃতির ছবিতে এই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। অবশ্য আরো বহু অংশ অগ্নিকাণ্ডে ও নেপোলিয়নের ফরাসী সৈন্যদের দস্যুতায় পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে,—কিছু মাদ্রিদেও স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বাকি যা আছে তার মূল্য কম নয়।

এখানকার তিৎশিয়ানের 'শেষ ভোজন' ছবিটি ও লুভ্‌রে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'শেষ ভোজন' ছবি দুটির তুলনা করবার ইচ্ছা যে-কোন চিত্তরসিকের মনে স্বতই জেগে উঠবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এখানে আছে। তা হচ্ছে দেওয়ালে আঁকা সারি সারি ফ্রেস্কো ছবি—গ্রেয়েগ্রিন, লুই দ্য কার্বাথাল, কাম্বুচ্চি ও লুকা জ্যোর্দানোর আঁকা যিশু খ্রীষ্টের সারা জীবনের কাহিনী। মনের মধ্যে কি করুণভাবে আঘাত করে ক্রুশ থেকে খ্রীষ্টের দেহ-অবতরণের

চিত্রটি। এই খ্রীষ্ট-জীবনের ভাববস্তু স্পেনে কত জায়গায়, কত শিল্পীর কল্পনায়, কত বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় দেখলাম।

যে সব ইয়োরোপীয় ভাগ্যান্বেষী জাতি বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের আশায় মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিল তাদের মধ্যে ইবেরিয়ান পেনিনসুলার অধিবাসীরাই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী খড়্গহস্ত হয়েছিল। যে ষাট বছর পোর্টুগীজরা স্পেনের অধীনে ছিল তখনও ভারতবর্ষে তাদের পৌত্তলিকদ্বেষ বিন্দুমাত্র কমেনি।

আশ্চর্যের বিষয়, স্পেনে এসে দেখছি যে সে যুগে এরা নিজেরাও কম পৌত্তলিক ছিল না। এবং এখনও এদের এ বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয়নি। সালামাঙ্কা, তলেদো ও এস্কোরিয়ালের গির্জা দেখে বার বার ভাবি যে সাকার পূজা ক্যাথলিকদের মধ্যেও হিন্দুদের মতই কত সুন্দর ও মধুর প্রথা এনে দিয়েছে, পূজার মন্দিরে কত ধূপগন্ধ, দীপমালা, কত চামরব্যজন, কত সন্ধ্যারতি। আমাদের মতই এদের তীর্থযাত্রা, পর্বদিবস, আমাদের মতই প্রণতির বিচিত্র বিচিত্র বিকাশ। খ্রীষ্ট, ত্রিমূর্তি, পরমমাতা মেরী, এঁরা এদের দেবতা; এঁদের চিত্র বা মূর্তি এদের কাছে হিন্দুর প্রতিমার মত।

এঁদের জীবনকাহিনী হচ্ছে ক্যাথলিকের পুরাণ। এঁদের সামনে কত নতমস্তকে প্রার্থনা, পাপস্বীকার, অশ্রুপাত, দূর থেকে 'কাতিড্রাল' দেখে কত বিনীত ভাব ধারণ। সবচেয়ে বেশী পৌত্তলিকতা দেখলাম এস্কোরিয়ালের গির্জায়। রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলির অন্যতম এ গির্জাটিতে মাটি ও পাথরে গড়া মেরীর প্রতিমা আছে, তার পিছনে বন ও ঝরনার চিত্র তৈরী করা আছে। মোমবাতি ও ধূপকাঠিতে সেখানে হিন্দু মন্দিরের আবহাওয়া পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিরাজ করছে। তবে তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থান অধিকার করে আছেন একা যিশু খ্রীষ্ট।

সমস্ত স্পেন জুড়ে লোকের মন ভরে রেখেছিল এক খ্রীষ্টের জীবনী। ক্যাথলিক ধর্ম, তার বাহন রাজতন্ত্র ও স্পেনে যে অবিচ্ছেদ্য ছিল তা বার বার বুঝতে পারছি ও বিবিধ প্রমাণ পাচ্ছি। দেশটার কি দুর্ভাগ্য! বড় বড় সম্রাট পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর আহৃত বিপুল ঐশ্বর্য দেশের লোককে দরিদ্র, অনুন্নত রেখে মন্দিরের পর মন্দির নির্মাণে ব্যয় করে গিয়েছেন। দেশের সাধারণ লোককে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত রেখে উপাসনায় অনুষ্ঠান ও উপকরণ-

গুলিকে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। যাজককে যোদ্ধার উপরে সম্মান দিয়ে, ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দাবিকে আভিজাত্যের চেয়ে বড় করে দেখে পরাক্রমশালী দেশকে নির্বীর্য অলস করে জনশক্তির হানি করে গিয়েছেন। ধর্মের নামে দেশের শ্রেষ্ঠ বণিক ও কৃষক ইহুদী ও মূরকে বিতাড়িত করে, স্বাধীন চিন্তাশীলতার কণ্ঠরোধ করে দেশকে ডুবিয়ে দিয়ে শান্তি লাভ করেছেন।

এই এস্কোবিয়ালের গির্জায় যে সুকুমার বালকরা আজ প্রভাতে মধুর উদাত্ত কণ্ঠে উপাসনা করে হরিদ্বারের পুরোহিত-বালকদের মন্দিরচত্বরে সামগানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, এদের জীবন সমাজ ও দেশের দিক থেকে কতখানি সফল হচ্ছে ?

কিন্তু দেশের একটা সৌভাগ্য এই ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মের ভিতর থেকেই এসেছে। এত মন্দিরশিল্পের ও চিত্রকলার প্রসার ও উৎকর্ষ স্পেনে ক্যাথলিক ধর্ম ছাড়া আর কোন প্রভাবই সম্ভব করে তুলতে পারত কিনা সন্দেহ। এখানে শিল্পের একধারে বাহন ও বিষয়বস্তু হয়েছে ক্যাথলিক ধর্ম, বিশেষ করে খ্রীষ্টের জীবনী। রাজা ও অভিজাতবর্গ বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করেছেন, বহু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কারণ তাঁদের মনে হয়েছে যে, শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে হবে ধর্মের প্রচার।

অবশ্য ইয়োরোপে সব দেশেই শিল্প ও রসসৃষ্টির দিক দিয়ে ক্যাথলিকের দান বিপুল এবং প্রটেস্টান্টের চেয়ে বেশী। মধ্যযুগে শিল্পের দিক দিয়ে প্রটেস্টান্টরা সৃষ্টির চেয়ে সংহারই করেছে বেশী। বাখ (Bach) ছাড়া আর কো প্রটেস্টান্ট মন্দির-সঙ্গীতকারের নাম হঠাৎ মনেই আসে না।

কিন্তু এজন্য স্পেনকে কম দাম দিতে হয়নি। অন্য কোন ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র দেশে ও বিদেশে ধর্মের প্রচার ও বিস্তারের জন্য এমন ভাবে নিজের সর্বনাশ করেনি ফ্রান্সও ক্যাথলিক হয়েছিল, কিন্তু এমনভাবে নিজেকে রিক্ত করেনি। এ যে সর্বাঙ্গকে ক্লিষ্ট অপুষ্ট রেখে মুখের প্রসাধন। ইটালিও ক্যাথলিক ছিল ও ধর্মের ভিতর দিয়ে শিল্পের উন্নতি স্পেনের চেয়ে কম করেনি, কিন্তু স্পেনের মত নিজেকে ক্যাথলিক ধর্মের জন্য সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি। স্পেন করেছে চূড়ান্ত তাই তার শিল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরাণিকতা নেই, পেগানিজম্ নেই।

কি আশ্চর্যের বিষয়, যে সম্রাট ধর্মপ্রাণতায় ধর্মপ্রচারের আতিশয্যে তরবারির মুখে জলন্ত আগুনের প্রয়োগে (Inquisition) ক্যাথলিক ধর্ম রক্ষা ও বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, তাঁর নিজের শেষ জীবন ছিল একেবারে সন্ন্যাসীর মত আড়ম্বরহীন

ও দুর্বলের মত অসহায়। এস্কোরিয়ালের গির্জা প্রাসাদের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ ও সুন্দর। নিয়তির পরিহাস! শেষ বয়সের অসুস্থতার জন্য প্রাসাদের যে-কক্ষের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বিছানা থেকে তাঁকে 'ম্যাস' উপাসনা দেখেই তৃপ্ত থাকতে হত, সেই দীনাতিদীন ঘরটিই আজ এখানে সব চেয়ে আকর্ষণের জিনিস।

ফিলিপ ছিলেন স্পেনের ঔরঙ্গজেব।

৫

মাদ্রিদে আবার ভারতবর্ষকে মনে পড়ল।

পথে পথে বেলিনের সুকঠিন সুষ্ঠু শৃঙ্খলা নেই, লণ্ডনের গতির স্রোতে ভেসে যাওয়া নেই। ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রে পুয়ের্তা দেল সল অর্থাৎ সূর্যতোরণে শহরের কেন্দ্রস্থলে সকলেই নববর্ষকে যেভাবে অভিনন্দিত করে নিল, তার মধ্যে শুধু যে আনন্দের উল্লাসই আছে তা নয়, তার মধ্যে আছে মথুরার পথে দোলের দিনের মত হল্লা ও হল্লোড়। রাস্তায় চলতে চলতে হিস্পানীরা বন্ধুর দল পাকিয়ে এমনভাবে পথ জুড়ে গল্প করবে যেন তাদের খাসদখল প্রমাণ হয়ে গেছে। এ যেন হট্টগোলের শহর। লোকের চিৎকার ছাপিয়ে ওঠে অটোম্যাটিক ট্রাফিক সিগন্যালের আলোর সঙ্গে ঠংঠং করে ঘণ্টধ্বনি।

স্পেনের সুন্দর রাজধানীটি ছোট, কিন্তু তার ঘোষণা বেশ বড়।

বিদেশী পর্যটকের কাছে স্পেনের যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায়নি। তার কারণ প্রধানত দেশের অনুন্নত অবস্থা, বাহিরে বিজ্ঞাপনের অভাব ও ভিতরে রাজনৈতিক বিপ্লব। নতুবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশালা হিসাবে 'প্রাদো'র অঙ্গনে আরো বেশী চিত্ররসিকের সমাগম হত। গ্রেকো, ম্যুরিলো, ভেলাসকেথ, গোইয়া প্রভৃতির যথাযোগ্য প্রকাশ এখনো হয়নি বলে মনে করি। কাজেই 'প্রাদো'র সঙ্গে একটু ভালো করে পরিচয় হওয়া ভাল।

তিৎশিয়ানের শিষ্য ও মাইকেল এঞ্জেলোর দ্বারা প্রভাবান্বিত ক্রীটের সন্তান এল্ গ্রেকো যদি শুধু একটি চিত্র—"কাউন্ট অর্গাথের কবর" চিত্র—এঁকে শিল্পজগৎ থেকে বিদায় নিতেন তবু তাঁকে সে জগৎ চিরকাল স্মরণে রাখতো। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই শিল্পী ইটালীয় শিক্ষার সঙ্গে হিস্পানী অনুভব মিশিয়ে স্প্যানিশ শিল্পের দুই ভারকেন্দ্র বাস্তবতা ও আধিভৌতিকতার সামঞ্জস্যের

শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। বিচারকরা বলেন যে এমন একটি চিত্র অতীতের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ছিল এবং ভবিষ্যতেও অসম্ভাব্য থাকবে। এতে হিস্পানী জাতীয় চরিত্রের মাধুরী ও চঞ্চলতা, চলনশীলতা ও তীব্র অনুভূতির যে সবল প্রকাশ পাই তা কোন হিস্পানী চিত্রকরও দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

আশ্চর্যের বিষয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বিশেষত প্রতিকৃতিকার ভেলাসকেথের নাম উনিশ .শতকের আগে খুব কম বিদেশীই জানত। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের চিত্রাকাশ তাঁর তুলির স্পর্শে চিরসুন্দর হয়ে আছে। তাঁর ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের ছবিটি খ্রীষ্ট-সম্বন্ধীয় সব ছবির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম। খ্রীষ্ট-জীবনের চিত্র-চয়নিকায় এটি না থাকলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রসবেত্তারা মনে করেন যে জীবনের এই শ্রেষ্ঠ অনুকৃতিকার বাস্তব রাজ্যকে কল্পনার মায়াস্পর্শ ছাড়াই রাঙিয়ে গিয়েছেন।

'লাস মেনিনাস' অথবা 'দি মেড্‌স্ অব অনার' নামক ছবিটি স্বাভাবিক প্রতিকৃতির জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। এতে শিল্পী নিজে রাজা চতুর্থ ফিলিপ ও রানী মারিয়ার ছবি আঁকছেন দেখা যাচ্ছে। পটভূমিকার সামনে মাঝখানে ও পিছনে এমনভাবে বিষয়বিন্যাস করা হয়েছে যে মনে হয় আমরা স্টুডিয়োর মধ্যে দাঁড়িয়ে শিল্পীকে ছবিটি আঁকতে দেখছি। দূর কোণে একটি ক্ষীণ আলোকে জানালার পর্দার অন্তরালে ক্ষীণতর রেখায় প্রকাশিত দেখা যাচ্ছে আরো দুটি আলোর চতুষ্কোণ। ক্ষীণতর চতুষ্কোণটির মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছেন রাজা ও রানী—দুজনেই চিত্রকরের তুলির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। সত্য ও জীবনের একটি রূপময় উদ্‌ঘাটন হয়েছে সমগ্র চিত্রটিতে। এতে যে শক্তি, সম্ভ্রম ও মাধুর্যের পরিচয় পাই তা শিল্পীর নিজের জীবনের চিন্তালেশহীন শান্তির আভাস দেয়। সার টমাস লরেন্সের কথা মনে পড়ে—যা আঁকতে চাওয়া হয়েছিল তার এমন নিখুঁত সাফল্য এতে হয়েছে যে এই ছবিকে 'আর্ট অব ফিলজফি' বলা যায়। লুকা জ্যোর্দানো এর যে প্রশংসা করেছেন তার অনুবাদ করা চলে না—তাঁর ভাষায় এই ছবিটি হচ্ছে, 'ফিলজফি অব পেন্টিং'।

সপ্তদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ম্যুরিল্যোর প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে ধর্মমূলক এবং খ্রীষ্ট-জীবনকে আশ্রয় করেই তা রূপ পেয়েছে। এই বিষয়টিতে তিনি মানবের অনুভবের ও প্রেরণাময়তার যে রকম সুন্দর সঞ্চার করেছেন তা ইটালির

শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও দুর্লভ। 'প্রাদো'তে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে পাশাপাশি সাজানো তাঁর দুটি 'ইম্যাকুলেট কনসেপশন' ঘোষণার চিত্র— যার মূল চিত্রটি লুভ্‌রে দেখতে পাওয়া যায়। এতে রিবেরার বর্ণচাতুর্য, ভ্যান ডাইকের মাধুর্য ও ভেলাসকেথের প্রাণময় বাস্তবতার সমাবেশ সমন্বয় দেখতে পাই। ত্রস্তা ব্যাকুলচিত্তা কুমারীর মধ্যে স্বর্গের পারিপার্শ্বিকতা সত্ত্বেও দেবীসুলভ রূপ নয়. অলৌকিকের প্রভাব নয়, মানবের অনুভবই বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া ম্যুরিলো জনতার মধ্যে প্রাণসঞ্চারের যে কৌশল তাঁর চিত্রগুলিতে দেখিয়েছেন তা পৃথিবীতে অতুলনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছে।

তাঁর পর এত শতাব্দীর মধ্যে পিকাসোকে বাদ দিলে মাত্র আর-একজন স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী বিশ্বশ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন। উনিশ শতকের ও তার পরের আধুনিক চিত্রশিল্পের পিতা বলে স্বীকৃত গোইয়া স্পেনে চিত্রশিল্পের প্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজবংশের চিত্রগুলিতে যে অনুসন্ধিৎসু এমনকি ক্ষমাহীন চরিত্রবিশ্লেষণ আছে তার তুলনা কোথায়? একটি গৌরবময় যুগের শেষ সন্ধ্যায় একটি অস্তমান রাজসভার অদ্ভুত চিত্রাবলী তিনি এঁকে গেছেন। তাঁরই তুলিকায় রূপ পেয়েছে নগ্ন চিত্রের শ্রেষ্ঠ একটি উদাহরণ। জগৎটা তাঁর কাছে যেন একটা প্রহসন; কখনও গম্ভীর বিদ্রূপে, কখনও সাবলীল সরলতায় তিনি সমসাময়িক স্পেনের অন্তর উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন।

স্পেন অ-ক্যাথলিক ধর্মের উপর যত অত্যাচার করেছে, সৌভাগ্যের বিষয় অ-ক্যাথলিক শিল্পের উপর তত করেনি। সেই জন্য সালামাঙ্কা ও সেভিলের গির্জায় মিশ্র কারুকার্যের চমৎকার মনোহারিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। তার আবেদন শিল্পের ছাত্রের চেয়ে রসিকের কাছে বেশী। সেই জন্য সেভিলের 'আলকাথার' রাজপ্রাসাদও এত সুন্দর মনে হয়। কিন্তু স্পেনের খ্রীষ্টধর্ম কর্দোভার 'মেথকিতা'কে অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্যে থাকতে দেয়নি। আবদার রহমানের এই অনুপম মসজিদটি বিশালতায় রোমের সেন্ট পিটার্সের পরেই ও সেভিলের গির্জার সমান। অপরূপ শ্বেতলোহিত খিলানের এই মসজিদের ভিতরেই একটি উচ্চ বেদী ও অন্যান্য খ্রীষ্টান স্তম্ভ বসানো হয়েছে। সেজন্য সম্রাট পঞ্চম চার্লস ভর্ৎসনা করে বলেন, "তোমরা এখানে যা নির্মাণ করেছ তা অন্য যে-কোন জায়গায় করতে পারতে; এবং পৃথিবীতে যা অতুলনীয় ছিল তা তোমরা ধ্বংস করেছ।" ৪৭০০ সুরভি তৈলের দীপে আলোকিত স্বর্ণ ও স্ফটিকের স্তম্ভময় মেহরাবের

নিকটে উনিশটি তোরণ দিয়ে মুররা যখন উপাসনা করতে আসতেন, তখন সে দৃশ্য কি হত তা আজ শুধু কল্পনাই করা যায়।

৬

স্পেন হচ্ছে উৎসবের দেশ। এর পথেঘাটে বর্ণ-বৈচিত্র্য, মনোভাবের বিকাশ ও অন্তরের বহির্মুখী উল্লাস। সেভিলের রাজপথের প্রাণবান ও বৈচিত্র্যময় দৃশ্যের বহু চিত্র-বর্ণনা আমরা পাই। এমনকি, এই বিশেষত্ব গীতিনাট্যের সুরেও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। মোৎসার্টের 'ফিগারো' ও 'ডন জোভান্নি' রসিনির 'বারবিয়ের দি সেভিল্যা' ও বিৎসের 'কারমেন' গীতিনাট্যের বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত নাগরিক ও গ্রামবাসীদের পৃথিবীর দ্বিতীয় বিশাল গির্জাটির চিত্রপটের সামনে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে।

অপেরা তো শুধু গীতিও নয়, শুধু নাট্যও নয়। তবু গীতিনাট্যের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এর সাফল্যের উপকরণ অথবা কারণ হিসাবে দেখতে গেলে গীতির একান্ত মূল্যের কথা ওঠে সবচেয়ে পরে। কিন্তু অমরত্বের বিচারে গীতির মূল্যই সব চেয়ে বেশী।

কিন্তু অপেরা অমরতার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। এবং সমসাময়িক গানের ইতিহাসের অঙ্গনে আসন পাবার জন্য যতটুকু গীতিমূল্য থাকলে চলে শুধু ততটুকুর উপর নির্ভর করেই এ সফল হয়ে চলতে পারে। অন্যপক্ষে নাটকীয়তার প্রয়োজন খুব বেশী এবং মঞ্চোপযোগী গুণ না থাকলে কোন অপেরাই চলতে পারে না।

কাজেই যখন অপেরার যবনিকা আমাদের প্রতীক্ষমাণ দৃষ্টির সামনে উঠে আসে তখন বিচিত্র দৃশ্যসজ্জা ও পট আমাদের মানসচক্ষুর সামনে ধরে দেয় এই দেশের অপরূপ নাটকীয়তাময়, রঙ্গপ্রবণ মানবের শোভাযাত্রা। সাধারণ ও গানের কান নেই এমন দর্শকের জন্য গানের উৎকর্ষের তত প্রয়োজন নেই। সুরমাধুর্য যেখানে তাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না, দৃশ্যবৈচিত্র্য সেখানে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মাদ্রিদের সমাজের সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা, বার্সিলোনা ও ভ্যালেন্সিয়ার অবসরহীন বণিকসভ্যতা ও বিপ্লবের সূচনাকেও ছাপিয়ে ওঠে হিস্পানীদের উৎসব-

প্রবণতা। বিশেষ করে সেভিলে যে গ্রামবাসীরা ষাঁড়ের লড়াই বা মেলা বা তামাশা দেখতে আসে তারা বিচিত্র প্রাচীন প্রথা, উজ্জ্বল বর্ণসমৃদ্ধ পরিচ্ছদ, রুচিবিদগ্ধ রসিকতা এবং মার্জিত ব্যবহারে পূর্বকরোজ্জ্বল ঐতিহাসিক আন্দালুসিয়াকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে।

সেভিলের মত এত উৎসব আর কোথাও হয় না ; বিশেষত ইস্টারের সময়। প্রাচীন সেভিলের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলিপথে মুরীর ছাপ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ হোটেলের ভোজনশালাটিও মুরীয় কারুকার্যে সজ্জিত থাকবে। সে গলিপথের ভিতর দিয়েই যে-সব ট্রাম যাচ্ছে, তার পাশেই যে বিস্তৃত সুন্দর 'পাশিও দি লস্ দিলিথিয়াস' নামে 'বুলভার্দ' রয়েছে সেগুলি যেন অলীক। সেভিলের আরব বণিক, কৃষ্ণ পোশাকাবৃত সন্ন্যাসী ও উৎফুল্ল প্রশংসাগর্বিত 'মাতাদোর'দের সঙ্গে সেগুলি খাপ খায় না একটুও।

গ্রানাদার 'আলহাম্ব্রা'তে ঠিক এমনি একটা আভাস পাই। ঐশ্বর্য ও কারুকার্যে আলহাম্ব্রা প্রাসাদ শাহ্‌জানের আগ্রা দুর্গের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ আরও প্রাচীন। কালের আঙুলের ছাপ একে আরও যেন বেশী অনন্যভূত আকর্ষণ দিয়েছে ; আর জেনারিলিফে উদ্যানের মত কোন উদ্যান আগ্রা দুর্গে নেই। অনবদ্য মুরীশ কারুকার্য-খচিত এই প্রাসাদটি যে পাহাড়ের উপর তা যেন স্পেনের মধ্যে নয়। এর চারিদিকের অলিন্দ থেকে যে ধূসর দৃশ্য দেখা যায়, "নিত্য-তুষারা" যে সিয়ারা নেভাদা চিরকালের প্রহরীর মত সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর পর্বতগুহায় যে জিপ্সিরা বাস করে তারাই যেন এখানকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সত্য। আর বাকি সবই অলীক। সৌভাগ্যের বিষয়, স্বল্পালোকিত প্রস্তরবন্ধুর গিরিপথ দিয়ে এখানে উঠে আসতে হয়। বিংশ শতাব্দীর মোটরগাড়ির রূঢ় আত্মঘোষণা আলহাম্ব্রার সান্ধ্য তন্দ্রাটি ভঙ্গ করে না।

এদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা চিন্তাহীন উল্লাস ও আন্তরিক উচ্ছ্বাস আছে যা দেখে স্পেনের বিপ্লববাদ ও সংঘর্ষকে সত্য বলে মনে করা কঠিন। বার্সিলোনার 'রামব্লা' রাজপথে 'প্লেন' গাছের ছায়ায় বন্ধু-বান্ধবীর দল হাস্যমুখে কৌতুক-পরিহাসের মধ্যে যে রকম করে বেড়ায় তাতে দৈনিক খবরের কাগজের বার্সিলোনা বলে মনে হবে না। প্যারিসের শাঁজেলিজি রাজপথের সভ্যতার কৃত্রিমতা এখানে নেই।

এরা এত সহজভাবে বিদেশীকে বন্ধু করে নিল যেন এই রাজপথে ও ভ্যালেন্সিয়ার উৎসবের মেলা 'ফেরিয়া'তে কোন প্রভেদ নেই। পথে পথে রৌদ্রের আভায় সুন্দর কমলাকুঞ্জ অন্তরের দ্বার মুক্ত করে দিল, আর স্পেনের আন্তরিকতা পরকে অভ্যর্থনা করে আপন করে নিল। এমনই আন্তরিকতার সঙ্গে 'প্রাদো'তে একটি শিল্পী তার বহু যত্নে আঁকা ইম্যাকুলেট কনসেপশ্যন ঘোষণা চিত্রটির প্রতিলিপির জন্য এই অজ্ঞাত বিদেশীর কবিতা গ্রহণ করেছিল :

তোমরা আঁকিয়া যাও ক্ষণিকের ভাবনা বিকাশ
অসীমের একটু কণিকা,
আমরা রাখিয়া যাই চিরদিন হৃদয়-উচ্ছ্বাস
প্রাণে পাই সুন্দরের লিখা ;
কত কথা কয়ে ওঠে তুলিকার নীরব ভাষায়
তোমাদের কল্পনার ছায়া,
আমরাও দেখি তাই বার-বার আনন্দে আশায়
যে স্বপ্ন লভেছে হেথা কায়া।

স্পেনের স্বপ্ন

১

ইয়োরোপের অন্য দেশগুলি অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু স্পেন অতীতের মধ্যেই বেঁচে আছে। তাদের উদ্দেশ্য অতীতকে সাজিয়ে রাখা—গৌরব অনুভব করবার জন্য, বর্তমানকে দেখাবার জন্য ও বিদেশীকে দেশে আকর্ষণ করবার জন্য। স্পেন নিজেই হচ্ছে অতীতের মুখর প্রতীক, মূক সাক্ষীমাত্র নয়। তার মধ্যে সে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, বর্তমানকে মিশিয়ে দেয় ও স্বদেশের প্রাচীন রূপটির আভাস দেয়।

স্পেনের অতীত যেন নিজের জন্যই বেঁচে আছে; লোক দেখানোর জন্য নয়। বিদেশী পর্যটকের জন্য সে এতদিন ব্যস্তও ছিল না। মাত্র ত্রিশের দশক থেকে বিদেশীর দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে দেশ-ভ্রমণ ও অবসর-বিনোদনের জন্য। ইয়োরোপের সব দেশেই বাইরের দর্শক আকর্ষণ করতে টুরিস্ট এজেন্সী সৃষ্টি হয়েছে বহু বহু বছর থেকে। কিন্তু "পাত্রোনাতো ন্যাথনাল দেল তুরিসমো" বেশী দিনের প্রতিষ্ঠান নয়।

জীবনের সব বিকাশের মধ্যেই অতীতের অস্তিত্ব ও দাবি আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। বিভিন্ন প্রদেশগুলি এখনো তাদের চারশত বৎসর আগে হারানো প্রাচীন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে এক দেশ হতে চায় না। সেজন্য স্পেনের অমর বীর রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও ফিলিপের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। ফিলিপ সমগ্র স্পেন এক ধর্মরাজ্যে বাঁধবার চেষ্টায় প্রদেশগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা যে কৌশলে হরণ করেছিলেন, সে কথা এদের অন্তরে দাবানলের মত জ্বলে স্পেনের প্রতি তাঁর বিরাট দানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে ক্যাতালান প্রদেশগুলি তাদের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, স্পেনের রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাঙন এখান থেকেই আরম্ভ হবে*।

লণ্ডন ও প্যারিস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যতখানি, মাদ্রিদ স্পেনের ঠিক ততখানি নয়। বার্সিলোনা, সেভিল ও ভ্যালেন্সিয়া মাদ্রিদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে পাল্লা

*স্পেনের গত আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে বস্তুতঃ তাই হয়েছিল।

দেয়। রাজনীতিক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার জন্য বার্সিলোনা শুধু স্পেনের বোম্বাই হয়েই ক্ষান্ত নয়; তার চিন্তা ও গতি স্বতন্ত্র। মাদ্রিদকে সে উপেক্ষা করতেও পশ্চাৎপদ নয়। কাজেই মাদ্রিদ স্পেনের রাজধানী বললেই সবটুকু বলা হয় না। তাকে এখনো শহর (Ciudad—থিউদাদ) বলে স্বীকার করা হয়নি, সে হচ্ছে শুধু villa.

সার্থকনামা কিন্তু এই ভিলা। এর চারিদিকের গিরিশ্রেণীশোভিত পারিপার্শ্বিক দৃশ্য এত সুন্দর যে ভিয়েনা ছাড়া কোথাও বুঝি তার তুলনা মেলে না। কথায় বলে ভিয়েনা পূর্ব ও পশ্চিমে সঙ্গীত, উত্তরে নৃত্য ও দক্ষিণে প্রণয় দিয়ে ঘেরা। মাদ্রিদ সম্বন্ধেও ওই রকম কোন প্রবাদ রচনা করলে সে প্রবাদের সার্থকতা হত।

সবদিকে সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা এই শহর। রাজপ্রাসাদ থেকে যে দৃশ্য দেখা যায় তাতে একটি ছোট জনাকীর্ণ রাজধানীতে আছি একথা বিশ্বাস করা কঠিন। পাসিও দেল প্রাদোর রমণীয় রাজপথে বেড়াতে বেড়াতে একে মোটেই কোলাহল-মুখর, ট্রেড ইউনিয়ন-সঙ্কুল শহর বলে মনে হয়নি। এখানে যত শ্রমিকসঙ্ঘ ও সমাজবাদীসঙ্ঘ আছে, রাশিয়া ব্যতীত আর কোন দেশের শহরে বোধ হয় এত নেই। শহরের উপকণ্ঠেই সেনাশিবির। পল্লীর পথকে কলিকাতার মেছুয়াবাজার বলে ভ্রম করলে বিশেষ ভুল হবে না।

তবু এ শহর বিরামের অমরাবতী, চিত্তপ্রসাদের প্রমোদকানন। ব্যাঙ্ক-পল্লী ভিন্ন আর কোথাও উদ্দামগতির ঔদ্ধত্য বা ব্যস্তবাগীশতার চিহ্ন নেই। এই ভোজনবিলাসীর তীর্থে সাধারণ হোটেলেও নটি পর্বের ভোজন উপভোগ করতে করতে কতবার মনে হয়েছে লণ্ডনের পরিবর্তে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হলেই ভাল হত। তা হলে লণ্ডনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে নববর্ষকে উদ্দাম নৃত্য দিয়ে অভিনন্দন করার দৃশ্য সবচেয়ে বড় বলে মনে হত না। বারোটি ঘন্টাধ্বনির প্রত্যেকটির সঙ্গে এক-একটি আঙুর মুখে দিয়ে নববর্ষকে অমনই সুন্দর সরসভাবে উপভোগ করবার স্বপ্ন দেখতাম।

ইয়োরোপের বর্তমান সভ্যতার বিকাশের প্রথম লক্ষণ দেখি বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের চেষ্টায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের বিরাট স্বর্ণময় কল্পনার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল ভারতবর্ষ। তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা ও তার

ফলে আমেরিকা আবিষ্কার হচ্ছে ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে স্পেনের শ্রেষ্ঠ দান। এ যে কত বড় তা একথা মনে করলেই বোঝা যাবে যে বর্তমান পৃথিবীই হচ্ছে ইয়োরোপের আবিষ্কার ও মানবসভ্যতাকে দান।

আমাদের সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা সম্বন্ধে একটা চমকপ্রদ ধারণা ছিল বটে। পেরুতে রামলীলার মত উৎসব বা মেক্সিকোতে গণেশমূর্তির মত মূর্তিপ্রাপ্তির উদাহরণ দেখিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা গমনাগমন প্রমাণের চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এ সবের দাম ব্যবহারিক বিজ্ঞানসম্মত ভৌগোলিক জ্ঞান হিসাবে কিছু নয়। শুধু আমেরিকা আবিষ্কারের স্মৃতিই ইয়োরোপকে কলম্বস তথা স্পেনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রাখবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিস্পানীদের চেয়ে বেশী দুঃসাহসী অভিযানে যেতে কেউ পারেনি। সমস্ত পৃথিবীতে ধনরত্ন আহরণ, সুচারুরূপে সাম্রাজ্যগঠন ও শাসন-ব্যবস্থা করতে স্পেন ছিল অতুলনীয়। পোপের নির্দেশ অনুযায়ী নূতন আবিষ্কৃত পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে পোর্টুগালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং এই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পোর্টুগালকেও ষাট বৎসর নিজের অধীনে রেখে দিয়েছিল। আর্মাডা ধ্বংসের ও ওলন্দাজ স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগে পর্যন্ত স্পেনের সমরপটুতা অতুলনীয় ছিল। স্পেনের সে দিনও নেই, সে গৌরবও নেই। তবু লোকের মন বিপুল ধনসাম্রাজ্যের অধিকারীর মত দিলদরিয়া আছে এখনো।

এদেশের সাধারণ লোকের কথায় কথায় রাজা-উজির মারাটা ঠিক নিষ্ফল বাগাড়ম্বরের মত হাস্যকর শোনায় না, এ যেন অতীতের স্মৃতির করুণ ঝঙ্কার!*

বর্ণসমস্যা স্পেনে কখনো ছিল না, এখনো নেই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহুদী ও মূরের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল, তার মূলে ছিল ক্যাথলিক ধর্মান্ধতা, বর্ণ নয়। ফ্রান্স যে রকম আফ্রিকান ফরাসী প্রজাকে সৈন্যদলে স্থান ও দেশের প্রধানমন্ত্রী বা সেনাপতি হবার পর্যন্ত আইনগত অধিকার দিয়েছে, স্পেনও তাই দিয়েছে। স্পেনে যে-কোন অশ্বেতকায় ব্যক্তি উদ্ধত কৌতূহল বা আঘাতপ্রবণ মন্তব্য না জাগিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে। নিগ্রো শ্বেতকায়ার সঙ্গে অবাধে নাচতে পারে, তার সঙ্গী হতে পারে। তাতে কোন গণ্ডগোলের

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অসম্পূর্ণভাবে লিখিত অধ্যায়ের প্রচুর উপকরণ সেভিলের Archivos des Indios এ আছে। এমন কোন স্প্যানিশ ও পোর্টুগীজ-জানা ভারতীয় ঐতিহাসিক কি নেই যিনি এগুলি থেকে জ্ঞান আহরণ করে সে অধ্যায় সম্পূর্ণ করতে পারেন?

সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এতে স্পেনের বিপদও হয়েছে সমূহ। ল্যাটিন আমেরিকায় একটি বর্ণসঙ্কর জাতি উদ্ভূত হয়েছে যারা হিস্পানী চরিত্রের দোষগুলি বেশ তীব্র মাত্রায় পেয়েছে। স্পেনের অধঃপতনের একটি ঐতিহাসিক কারণ জাতীয় বিশুদ্ধি রক্ষা না করা। তার প্রাচ্য সাম্রাজ্য ধ্বংসেরও একটি প্রধান কারণ এইখানে।

নিজেকে একদিনের জন্যও অপরিচিত বিদেশী বা অপ্রত্যাশিত অতিথি মনে হচ্ছে না। বিদেশী এদের দেশে অবহেলিত না হয়, অসুবিধায় না পড়ে, সেজন্য চেষ্টার পরিচয় কতবার পেয়েছি।

সালামান্কায় শেষ রাত্রে পৌছানোর পর তুষারপাতের জন্য দূরবর্তী হোটেলে যেতে পারলাম না। স্টেশনের ক্যান্টিনে কফির গ্লাস হাতে করে গুলের আগুনের ধারে বসে রাত কাটিয়ে দিতে হল। তখন এই বিদেশীকে সঙ্গ দেবার জন্য ক্যান্টিনের কর্তা ও তার স্ত্রী তুষারপাতের রাতের তপ্ত শয্যার আহ্বান উপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে গল্প ও হাস্যকৌতুকে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল। শহরের প্রাচীনতা ও দর্শনযোগ্যতা সম্বন্ধে তারা উপভোগ্য গল্প করে.যেতে লাগল। যে দূর বিদেশী এতদূর থেকে সালামান্কার গির্জা ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এসেছে সে যাতে এগুলি সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা নিয়ে যেতে পারে সেজন্য তাদের কত চেষ্টা।

সেভিলে মাত্র পথের আলাপে একটি আইনের ছাত্র বিদেশী ছাত্রকে আত্মীয় ভাবে সঙ্গ দিল। সারাদিন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর শহর, ডন কিখতের (Don Quixote) লেখকের স্মৃতি-সরোবর, ঐশ্বর্যময় রাজপ্রাসাদ আলকাথার (Alcazar দেখিয়ে বেড়াল ও সন্ধ্যাবেলা নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে চাইল।

গ্রানাদা থেকে কর্দোভার দীর্ঘ মোটরপথে জলপাইকুঞ্জে ঢাকা পর্বতের সানুদেশে ঘুরে মোটর চলার সময় সব আরোহীর সঙ্গে কত আলাপ হয়ে গেল, যার মাধুর্য ও আন্তরিকতা মনে ছাপ না রেখে পারে না। অথচ কত রকমের ও কত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার লোক সেখানে ছিল।

কত সময় কত শিক্ষিত ভদ্রলোক—বেকার নয়—অযাচিতভাবে সঙ্গ দিয়েছেন, নানা দ্রষ্টব্য দেখিয়েছেন, যেন কত দিনের পরিচয়। ভ্যালেন্সিয়া থেকে বার্সিলোনার ট্রেন যখন নীল ভূমধ্যসাগরের জলে বিধৌত প্রস্তরবন্ধুর অনুপম দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন বার্সিলোনার একজন প্রতিষ্ঠাবান গায়ক মনের আবেগে গান শুনিয়ে দিলেন "হে 'morena'," অর্থাৎ "বাদামী বর্ণের বন্ধু আমার"।

অনেক দেশে পেয়েছি ব্যবহারিক ভদ্রতা, এখানে পেলাম আন্তরিক সহৃদয়তা।

বিশেষভাবে ভারতবাসীর পক্ষে স্পেনকে ভাবজগতেও আপনার বলে ঠেকে। এখানে মনের হাসি অধরপ্রান্তে মিলিয়ে না গিয়ে ঝিকমিক করে আত্মপ্রকাশ করে। কেউ বিরক্তিকে ভদ্রতায় ঢেকে 'স্মাটস অলরাইট' বলে বসে না, অথচ ভারতবর্ষের মত আন্তরিকতার বড়াই করে হাজার অপ্রিয় কথা মুখে প্রকাশ করে ফেলে না।

এদের সামাজিকতার মধ্যে একটা সুষ্ঠু ভদ্রতা আছে, যা অন্তরকে আকৃষ্ট করবেই। শুধু কি তাই? সময়ে অসময়ে প্রবাসী মন অসতর্ক মুহূর্তে নিজের দেশে ছুটে আসবার সুযোগ পায়—এমনি একটা চিত্রপটের সামনে সে মন জেগে থাকে। যে অশ্বতরযান ধূলিধূসরিত রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে অকারণে, যে জনতা হাতে মুখে ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়ে শোরগোল করছে, পথে যেতে যেতে সহসা যে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি মেঘের আভাস ছড়িয়ে ও যে আঁখি-তারকা বিদ্যুৎ হেনে যাচ্ছে সে সব মিলে মনকে উতলা করে তোলে। ছয় হাজার মাইল দূরত্বকে নিমেষে লোপ করে দেয়।

২

দিকে দিকে এই জাতির উৎসবপ্রবণতার প্রমাণ পাই। এবং আর কোন দেশ বোধ হয় উৎসবের দিক দিয়ে প্রাচীন ও নবীন উভয়কেই এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেনি।

এ হিসাবে আমাদের দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিমের ভাবস্রোতের আবর্তে পড়ে আমরা নিজেদের প্রাচীন উৎসবগুলি হারাচ্ছি বা বিতৃষ্ণার চোখে দেখছি। দেশের রং আমাদের মনে কোন রং লাগাতে আর পারছে না।

অন্যদিকে আমরা সব পাশ্চাত্ত্য আমোদ প্রমোদও গ্রহণ করতে পারব না। যথা, আনন্দদায়ক সামাজিকতা ও বহুকে-সে আনন্দের প্রত্যক্ষ অংশীদার করা কত শোভন। তবুও বলরুমের নাচকে আমরা আপন করে গ্রহণ করতে পারি না। এই রকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

তার বিপক্ষে সিনেমা, ফুটবল প্রভৃতির কথা তোলা যেতে পারে। কিন্তু

আমি শুধু যে অনুষ্ঠানগুলি সমাজের সকলকে আনন্দের মধ্যে টেনে আনে তাদের কথাই এখানে বলছি।

এ হিসাবে স্পেন অনেক সজীব ও সক্রিয়; পুরাতন উৎসবগুলি একটুও ত্যাগ করেনি এবং নূতনগুলিকেও সাদরে গ্রহণ করেছে। Jazz-এর প্রচলন খুব বেশী হয়েছে, তা বলে Castanet-কে কেউ ফেলে দেয়নি। বিখ্যাত ও বহু-প্রাচীন 'বুল-ফাইট' বর্তমানকালের রুচি অনুসারে নিষ্ঠুর মনে হবে বলে তাকে কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে। কিন্তু 'টরসে'র নামে এরা আগেকার মতই উল্লসিত হয়ে ওঠে। 'মাতাদোরে'র সম্মান অভিজাত মহলেও এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রেষ্ঠ বৃষযোদ্ধাদের সম্মান কোন সেনাপতির চেয়ে কম নয়। অভিজাত সুন্দরীরাও এদের সঙ্গে পরিচয় রাখতে উৎসুক ও আলাপ করে উৎফুল্ল হন।

আর-একটি জাতীয় উৎসব হচ্ছে বার্ষিক মেলা ("ফেরিয়া")। এই মেলা-গুলির মধ্যে স্পেনের প্রাণের যে পরিচয় পাই তা ভারতবর্ষের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। নাগরদোলাটি পর্যন্ত ঠিক আছে; আর আছে সেই ধূলিধূসর, কোলাহলমুখর জনাকীর্ণ পথে দ্রব্যসম্ভার। সব জুড়ে আছে প্রাণের বিচিত্র উল্লাস—প্রচুর, বর্ণসমৃদ্ধ ও আড়ম্বরময়। দুর্লভ আরবী গন্ধদ্রব্য থেকে মুরীয় কারুকার্যখচিত সূক্ষ্ম ছুরিকা পর্যন্ত যা কিছু মধ্যযুগ সম্বন্ধে রোমান্টিক কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলতে পারে তার সবই এখানে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো দেখতে পাওয়া যাবে।

জীবনের স্রোত এদেশে গভীরতার চেয়ে প্রসারের খাতেই বইছে বেশী। নারী-প্রগতি এদেশে খুব বেশী দূর এগোয়নি। এমনকি পর্দা থাকলেও অভিজাত ও দরিদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীতে নারীজীবন বহুভাবে অবরুদ্ধ ছিল। তখনকার দিনের আধুনিকাদের ভাগ্যে নিন্দা ও সামাজিক অসুবিধার ভয় ছিল খুব বেশী। যুগলনৃত্যের প্রচলন ছিল খুব কম। ইয়োরোপে সব দেশেই এ যুগে নারী হয়েছে স্বাধীনা আর নারীজীবন হয়েছে বহির্মুখী।

কিন্তু হিস্পানী কাণ্ডই অন্যরকম। স্পেন যুগলনৃত্য যদি গ্রহণ করল তো তাকে 'অলিম্পিক' প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাল। এদেশে নাচ এত লালিত্যময়, মৃদুমধুর, কিন্তু এতে এরা ক্লান্ত নয়। মাদ্রিদের বাৎসরিক 'মারাথন' নাচ যেরকম সমারোহে সম্পন্ন হয় তা যেন একরকম জাতীয় উৎসব। এক হাজার ঘণ্টা যে যুগল অতিবাহিত করতে পারবে তারা বিপুল পুরস্কার পাবে। রাত্রির পর রাত্রি

আলোকে উজ্জ্বল ও বাদ্যে মুখর নৃত্যসভায় দর্শক আসবে, কোলাহল হবে। কিন্তু তার মধ্যেও এদের চোখের পর্দায় একাধিক সহস্র আরব্য রজনীর মত এক-একটি রাত্রি নূতন মোহ, নূতন আবেশ এনে দেবে। নর্তক-নর্তকীর দল ঘুমে আচ্ছন্ন-প্রায় হয়ে আসে, তবু প্রসাধন করে মুখের চুনকামটুকু ঠিক রাখা চাই।

এদের মত চূড়ান্ত করতে ইয়োরোপে কেউ পারবে না। সিনরিটাদের দেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে যদি পুরুষের ডাক পড়ে তা হলে এদেশের এরা শুধু ইংলণ্ডের মত অফিসে ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের কারখানায় পুরুষের স্থান অধিকার করেই নিবৃত্ত হবে না। রাজপুতানীদের মত জহরানলে আত্মাহুতি না দিয়ে রণক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী হবে ও পুরুষের স্থান অধিকার করবে। হিস্পানী কোমলাঙ্গী প্রমদারা প্রয়োজন পড়লে সহজেই পুরুষেরও প্রমাদ ঘটাতে পারে।*

দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এরা একটি সুকুমার স্বপ্নের সৃষ্টি করে যা চিরকাল ধরে আমাদের কৈশোরের কল্পনা ও যৌবনের অন্বেষণ। প্রত্যহের তুচ্ছতাকে এরা কি যেন এক মায়াকাঠির স্পর্শে উজ্জ্বল সার্থক করে তোলে, জীবনের উচ্ছল মুক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে, ভাবনাহীন কৌতুক-প্রমোদে, সুমধুর গীতবাদ্যে, মার্জিত অথচ সহজ রুচির বিকাশে। সাধারণ হোটেলের ভোজনশালাতেও ভোজন শেষে আঙুর-পর্ব চলবে, কক্ষান্তরাল থেকে গীতারের মাদকতাময় মৃদু মূর্ছনা ভেসে আসবে। মুরীয় কারুকার্যখচিত দেওয়ালে দা ভিঞ্চির বা তিৎশিয়ানের 'শেষ ভোজন' ছবিটির প্রতিলিপি থাকবে, টেবিলের আবরণটি মূরদের বিশেষত্ব-সূচক নীলবর্ণের হয়তো হবে।

তখন ধীরে—সুধীরে স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে মানসচক্ষে আলহাম্ব্রার মর্মরস্বপ্ন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অথবা সারাদিনের দর্শনক্লান্ত চক্ষু আরামে মুদিত থেকেই বিলাসপ্রিয়া সম্রাট-মহিষীদের লীলানিকেতন আলকাথারের শিল্পকলা আবার নিরীক্ষণ করতে থাকে। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই উজ্জ্বল নীলাকাশপটে বার্সিলোনার প্রাসাদ বিচিত্র বর্ণের আলোকরশ্মিসম্পাতে মনোহর হয়ে ওঠে। প্লেনগাছের ছায়াচ্ছন্ন যে পথ রৌদ্রের উত্তাপে মধুর হয়েছিল সে পথ স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরে যায়।

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে স্পেনের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে হিস্পানী নারীকে সশস্ত্র অংশ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে।

স্পেনে আমি ঠিক সময়ে এসেছি। শীতের প্রকোপেও এখনো কুঞ্জে কুঞ্জে রৌদ্রে কমলার রং বড় সুন্দর দেখায়—যদিও জানি এই কুঞ্জে বসন্তের চুম্বনপুলক বেশী মানাত।

আমি পরিণত পুত্রপুষ্পসম্ভারের বিকাশের মধ্যে কোন দেশে যেতে চাই না, কারণ সে সময় যে-কোন দেশ সুন্দর হয়ে সাজবে। আমি চাই বসন্তের আভাস, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূচনা। চাই কুঞ্জপথে এই কমনীয় কমলার নবীন পল্লবশোভা গুচ্ছে গুচ্ছে অনতিপক্ব ফল, পরিপূর্ণতার রসে আনত নয়, প্রথম অরুণিমার কৈশোর সৌন্দর্যে আকুল। এই মাটিতে স্নিগ্ধ স্পর্শ আছে, ভীরু কম্পিত ভায়োলেটের মত অনির্বচনীয় সুকুমারতা আছে, সরস নবীন প্রাণ আছে। আবেশে চোখ বুজে একটি সুন্দরতর জগতের আভাস পাই, যে দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে নেই, আছে শুধু কবিতায় ও কল্পনায়।

মাদ্রিদেরার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, তবু মদির আবেশ অনুভব করি। ভ্যালেন্সিয়ার নীল সমুদ্রসৈকতের কমলাকুঞ্জের মৃদু সৌরভ আমাকে পাগল করে তুলেছে। দেহবন্ধন যেন শিথিল মুক্ত হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার কী অনির্বচনীয় উল্লাস, কী অপরিসীম আনন্দ!

প্রাণ ও প্রকৃতি

ছবিতেও যে এত কবিতা কে জানত ?

শুধু একটি প্রাণচঞ্চল কিশোরী একটি পা বরফে রেখে অন্য পাটি বঙ্কিম-ভঙ্গিতে তুলে তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে স্কেটিং করে চলে যাচ্ছে—পিছনে তার চাঁদ উঠেছে, আননে মোহন হাসি, চরণে গতির লীলা, হাতছানিতে সুদূরের আহ্বান। আর

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।"

নীচে লেখা আছে,—আমার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে এস।

সেই আহ্বান আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিশে গেল।

গরমের দেশের লোক আমার সূর্যের মুখ চেয়ে দিন কাটাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে ঘরে আলোর আগমনবার্তা পাই, আর অন্ধকার এমনভাবে অতর্কিতে বিদায় নেয় যেন অনেক বেলায় দেরি করে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙেছিল। ক্রম-বিলীয়মান ঊষা বা সন্ধ্যা আমাদের নেই। সূর্য যে কখন রঙীন থেকে হলুদে পরিণত হয় তা টেরই পাওয়া যায় না।

আবার আমাদের সময় নিরূপণও হয় সূর্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হিসাব করে। ভাগ্যে সূর্যমামা আছেন, না হলে গ্রামের লোকটি কেমন করে আকাশের দিকে আঙুল তুলে সময় বোঝাবে সূর্য কোন্‌খানটায় ছিল তা দেখিয়ে দিয়ে ?

কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে এসে প্রভাতের মাধুরী ভিন্নভাবে প্রকাশিত দেখলাম। আর সূর্য দেখে সময় ঠিক করে চলার উপায়ও যে নেই তা বুঝলাম। প্রথম প্রত্যূষ থেকে একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত বরফে আলোর যে ঝকমকানি তাতে দিন যে কত হল তা বোঝে কার সাধ্য ?

এদেশের আকাশে নীলিমা ম্লানিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এত-টুকু ধুলার আভাস নেই, ধোঁয়া নেই; আকাশের স্বচ্ছ সৌন্দর্যকে এতটুকুও অন্তরাল করে না। মনের মধ্যেও এমনি মুক্তির আস্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। ঊষার আহ্বানে সেই উজ্জ্বল নীল আকাশের এক কোনায়

একটা পাহাড়ের পিছনে সূর্য যখন উঠি-উঠি করে, তার অরুণরথের আভা অন্যান্য কত পাহাড়ে পরশ লাগায়, আর চূড়ায় চূড়ায় বরফের সাদা লাল আবীর-গোলা হয়ে যায়। রং সুরের ঝঙ্কারের মত, তরঙ্গভঙ্গের মত, সৌরভ-বিস্তারের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়; মনের উপর পড়ে তাকে বাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেই সময়-টুকুর মধ্যে যখন ঘুম ভাঙে তখন আনন্দ ছড়িয়ে দেবার মত প্রশস্ত জায়গা সুইজারল্যাণ্ডের আকাশ ছাড়া আর কোথাও মেলে না। অসহ আনন্দ সুদূরের পিয়াসায় বেদনা হয়ে দেখা দেয়।

সেই মুক্ত আকাশে আমার আত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচল। হালকা পাখা নিয়ে পাখির মত যেন তা মনের খুশিতে উড়ে বেড়াতে পারবে; গিরিচূড়ায় গানের স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারবে।

"অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কী বাণীর সন্ধানে।"

যে বাণীর অনাহত ধ্বনি মনে এখনি যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে, আর সহ্য না করতে পেরে যেন শতধা হয়ে যাবে আমার মন।

শুধু আমার কেন, মানবাত্মার মুক্তি হবে এই আকাশের তলায়।

ইতিহাসের পাতায়ও তার প্রমাণ পাই। আবহমান কাল থেকে শিল্পী, বাগ্মী, সংস্কারক, দেশপ্রেমিক পালিয়ে এসে এদেশের বুকে আশ্রয় পেয়েছেন। সুইজারল্যাণ্ড না থাকলে ক্যালভিনের বিদ্রোহী প্রটেস্টান্টিজমের সৃষ্টি সহজ হত না, গ্রোটিয়াসের আন্তর্জাতিক আইনের মূল সূত্রটির প্রেরণা আসত না। রুশোর সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী যেন এখানেই আদর্শরূপে জেগে উঠেছিল, ম্যাৎ-সিনির নব্য ইটালির পরিকল্পনা এখানেই রূপ ধারণ করল। এমনকি, সেদিনকার রুশ-বিপ্লবের বীজও সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিতেই প্রথমে রোপণ করে রক্ষা করতে হয়েছিল। রুশের বিপুল রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজতন্ত্রকে ব্যর্থ করে লেনিন জগতে নূতন মতবাদ ও রাজপাট প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না পর্বত অরণ্যানীময় স্বাধীনতার লীলাভূমি এদেশে না থাকলে।

এদেশ হচ্ছে অত্যাচারীর চক্ষুঃশূল ও অত্যাচারিতের আশ্রয়। চারিদিকে চারিটি প্রবল বিবদমান রাষ্ট্রকে সংস্পর্শ দিয়েও সংঘর্ষ থেকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রেখেছে এই দেশ। এ না থাকলে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক অধ্যায়, রাজনীতির অনেক বিবর্তন বাদ থেকে যেত। অথচ এর নিজের শক্তিই বা কতটুকু। তিনটি ভাষা ও তেরটি প্রদেশ (ক্যাণ্টন) একে খণ্ড খণ্ড করে রেখেছে, তবু কত শতাব্দী ধরে এখানে গৃহবিবাদ বা আভ্যন্তরিক যুদ্ধ হল না।

পৃথিবীতে লীগ অব নেশন্‌স আর-একটি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু জেনিভা আর একটি হবে না। সব দেশের সব রাজধানীর উপর জেনিভাকে স্থান দিই। এমন বড় কিছু শহর নয়, এমন কিছু সম্পদশালী নয়; কিন্তু কত বিপ্লবী ও চিন্তাশীলকে বরাভয় দিয়েছে। পৃথিবীই বঞ্চিত হত তা না হলে। এ শহর হচ্ছে 'নন্‌-কনফর্মিস্ট'; এখানে আশ্রয় নেবার জন্য কোন দল বা রাজনীতির শরণাপন্ন হতে হয় নি কাউকে। রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচাতে হলে দুটি শহরের কথা তাদের মনে এসেছে—প্যারিস ও জেনিভা।

প্যারিস বিরাট, সুরূপ ও আহ্বানময়; জেনিভা সীমাবদ্ধ, সুন্দর ও আত্মসমাহিত। প্যারিস বলতে স্বাধীনতার আশ্রয় তত বোঝাবে না, যত বোঝাবে সুকুমার কলা ও বিলাসলীলা। কিন্তু জেনিভা বলতে প্রধানত বোঝাবে গিরিবেষ্টিত তুষারশোভিত স্বাধীনতার প্রকাশ। প্যারিসের পিছনে কত ভাবের বিকাশ, কত ঐতিহাসিক 'ট্রাডিশন' যা পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জেনিভার পিছনে লেক 'লেমানের' (জেনিভা হ্রদের) ওপারে তুষারশৃঙ্গ মঁব্লাঁ, যা সব সংস্কার ও ইতিহাসের উর্ধ্বে মাথা তুলে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। প্যারিসের দান মানবের হাতে তৈরী, জেনিভার দান প্রকৃতির।

এই স্বাধীনতার দেশটিতে কিন্তু একটি বন্দীর কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে এসে বায়রনের 'শিল'র বন্দীর দুর্গটি না দেখে কোন লোক চলে যায় না। আর বায়রনের মত বীরকবির উপযুক্ত বর্ণনার বিষয়ই হচ্ছে এদেশ। তিনি ছিলেন বীর; তাই মুক্তিকামী বন্দীর অন্তর যে প্রহরীকে এড়িয়ে মুক্ত আকাশে বিচরণ করত তা সহানুভূতি দিয়ে অনুভব করেছিলেন। আর তিনি যে ছিলেন কবি তা জেনিভা হ্রদে স্টীমারে বিহার করে সেই দুর্গে গেলেই বোঝা যাবে। এপাশের নিকটের তীর তীরবেগে যেন ছুটে চলে যায়, আর ওপাশের সুদূরের তীর পর্বতবেষ্টিত হয়ে স্থাণু হয়ে থাকে। ওপারে বরফের চিত্রপট, আর এপারে দ্রাক্ষাকুঞ্জের

জন্ম সাজানো সাহুদেশে কখনো কখনো শিল্পী ড্যুরেরের চিত্রের মধ্য থেকে একটি একটি গ্রামের সহসা দৃষ্টিপথে উদয়।

এ দেশ যেমন সান্ত্বনা দিয়েছে তেমনি দিয়েছে প্রেরণা। য়্যামিয়েলের 'জারন্যালে'র পাতায় পাতায় পাই এদেশের প্রভাব, তীব্র শীতের মধ্যে মনকে জাগিয়ে তোলার কথা। প্রকৃতি যখন নিরাভরণ তখনো তার মধ্যে মনের কত সম্পদ্ আহরণ। কত মনীষীকে অন্নের চেয়ে অধিক ধন, প্রাণের চেয়ে বড় প্রেরণা দিয়েছে এদেশের সৌন্দর্য। হলবীনের চিত্রগুলিতে যে গম্ভীর অনুভব ও জীবনের মুখোমুখি হবার ভাব পাই তাতে মনে হয় যে 'জুরা' পর্বতমালার রং তাঁর সব চিত্র জুড়ে বর্তমান আছে। শিল্পীর মনকে অভিভূত ও সৃজনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জুরা ছাড়া কত শিল্পীকে কল্পনাই করা যায় না।

সৌন্দর্য কখনো শ্রান্তি আনে না যদি প্রকৃতি নিজে থাকে প্রাণময়ী আর সে কান্তির মধ্যে থাকে কল্পনা। সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য কখনো মানুষের কাছে পুরাতন হয়ে যাবে না। নিবিড় হরিৎ গোচারণ-ভূমির রঙের বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না; শুধু একটা ইংরেজী কবিতার পঙ্‌ক্তি বলা চলে।

The emerald green of leaf enchanted beams—তার উপর বরফে বরফে যখন জুঁই ফুলের বৃষ্টি হয়ে যাবে তখন সে তুষারকণাগুলি লোভী বালকের মত মুখে পুরব, না পাতায় হীরামুক্তার গুঁড়া ছড়ানো দেখে দেখে চোখ জুড়াব ভেবে পাই না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় মন মূক থাকে না, মুখর ও উত্তরের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, এবং রঙের মায়াকাঠির স্পর্শে সবটা দেশ ভাষার আভাষে ভরে যায়।

অগণিত হ্রদে ভরা এই দেশ। প্রত্যেকটিই আবার বর্ণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সূর্যের কিরণে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় প্রত্যেকটিতে আবার স্বতন্ত্র রূপ খোলে। সবচেয়ে সুন্দর দেখায় যখন রাত্রির ঐশ্বর্য জলের বুকে প্রতিফলিত হয়। বিশাল পর্বতের ছায়া ও ভাসমান মেঘের মায়া পারের চঞ্চল গাছগুলির পাশাপাশি এমন একটা কম্পমান মাধুরী সৃষ্টি করে যে দিনের বেলাকার বেড়ানোর স্টীমার যে এর বুকে কোন বিক্ষোভ এনেছিল সে কথা মনেই হবে না। আর পারের নিস্তব্ধ 'শালে'গুলিকে ঘুমন্ত মায়াপুরী বলে মনে হবে।

কিন্তু আমার কাছে ছোট ছোট হ্রদগুলিই বেশী ভালো লাগে। সেগুলি দেখা দেয় অনেক উঁচুতে—দুর্গম স্থানে হঠাৎ দেখার বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে। মানুষের

রূঢ় চরণক্ষেপ তাদের ধ্যানভঙ্গ করে না। তাদের সৌন্দর্য অনুভব করা হয়, আয়ত্ত করা যায় না।

সুইজারল্যাণ্ডকে এত বেশী ভাল লাগছে পার্বত্যদেশ বলে। এক-একটা শৃঙ্গ যেন মানবাত্মার বাণীর প্রকাশ। সমতলের মাটির মোহ স্বচ্ছ লঘু ও অগভীর। তার উপর আকর্ষণ ছড়িয়ে যায়, কোথাও এসে ঠেকে না, জমাট বাঁধে না। কিন্তু অসমতলের প্রস্তরের প্রেম চূড়ায় চূড়ায় আকর্ষণের কিরীট পরে; তরঙ্গভঙ্গের লীলার মত, স্বরগ্রামের খেলার মত ঢেউ খেলে যায়। আর সমতল থেকে উচ্চতা মনকে উপরের দিকে টানতে থাকে অবিরাম, রাত্রিদিন। ওই বরফের শৃঙ্গ জেগে আছে চিরকাল, অতন্দ্র, নিদ্রার দ্বারা অনাহত হয়ে,—পথিকের জন্য, আমার জন্য।

* * * * *

আজ প্রকৃতির তুষারস্বপ্ন। এদেশের প্রকৃতিকে বলেছি প্রাণময়ী, এ কথাকে শুধু কথার অর্থ দিয়ে বিচার করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মানুষ নিজের হাতে ভৈরবীর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে, করে নিজে মন্ত্রসিদ্ধ হয়েছে। এই দুরন্ত শীতে গাছপালা সব বরফে ঢাকা, পথ লুপ্ত হয়ে গেছে, বৃষ্টির ধারার মত বরফ ঝরছে, আর সেই দেবতার দান তুষারবিন্দুরূপে সব জায়গায় শোভা পাচ্ছে। সারা বছরে মাত্র কয়েকটি মাস মানুষ প্রকৃতির এই নির্মম দান আশা মিটিয়ে পাবে; কিন্তু যেটুকু পাবে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করবে, নিজের প্রাণের রসে রসিয়ে নিয়ে।

ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে একটা উঁচু পাহাড়ে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এরা সেজন্য ক্ষান্ত হয় নি। সেখানে উঠেছে বিদ্যুতের তারের সাহায্যে 'টেলিফেরিকে'। এই জাদুঘর যখন নীচের পৃথিবী ছেড়ে ৩০০ ফিট উপরে উঠতে থাকে তখন জীবনটা একটামাত্র তারের উপর ঝোলে। কিন্তু তা বলে ভয় তো কেউ পায় না। সেই চূড়ায় উঠে এই চিরযৌবনসম্পন্নদের দল নাচবে, গাইবে, আবার খাবে। এরা যদি আমাদের দেশের লোক হত, তা হলে হিমাচলের গোপন সাধকদের চঞ্চল হয়ে পর্বত ছেড়ে অরণ্যবাস করতে হত, আর কয়েক বছরের মধ্যে এভারেস্ট না হোক, অনেক চূড়াতেই পূজার ছুটিটা কাটানোর বন্দোবস্ত হয়ে যেত।

উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলাম যে তুষার-সমুদ্রের তরঙ্গগুলি অপরূপ দেখাচ্ছে—

"তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।"

এই তরঙ্গিত শৃঙ্গরাজি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখের যবনিকা খুলে যায়, কানের পর্দা প্রতিধ্বনিতে স্পন্দিত হবার জন্ম উন্মুখ হয়ে ওঠে। এইখানে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের মর্মরহস্য যেন উদ্‌ঘাটিত হয়ে আছে মনে হল। যেন সে সঙ্গীতের ঝঙ্কার সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে চূড়ায় চূড়ায় তরঙ্গিত হয়ে পড়েছে বিরাট বৈচিত্র্য ও অসীম অনুভব নিয়ে। তার মূল সুরটুকু প্রকাশ পাবে ভারতীয় সঙ্গীতের মত বিজনতার বীণায় নয়, নিখিল বিশ্বব্যাপী অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কারে।

প্রকৃতি এদেশে নিষ্ঠুরা। এখানে 'কোমল-মলয়-সমীরে' অঙ্গ ঢেলে কাব্য-চর্চা করা যাবে না। তাই মানুষকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের আনন্দ আহরণ করে নিতে হচ্ছে। শীতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্ম শীতকেই এরা আক্রমণ করেছে 'স্কেটিং' করে, 'শী-ইং' করে, বরফের উপর দৌড়ঝাঁপ নাচ করে। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ পাহাড়ের চূড়ায় কত বরফ পড়ল, কোন্ হ্রদটা জমে গেল তাই হবে প্রত্যহ প্রভাতের প্রথম খবর। একদিন এমনই একটা সুসংবাদ শুনে লুজান থেকে ছুটে এলাম সাঁ-শার্গে বরফে খেলার জন্ম। আর সে কি খেলা? সে হচ্ছে জীবনের উপাসনা। তার মধ্যে কিন্তু মিনতি নেই, আছে পরাক্রম। বন্ধুর স্বতঃপ্রবৃত্ত যে দান তাতে মাধুর্য আছে। কিন্তু শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে ধন তার সার্থকতার সঙ্গে প্রথমটার তুলনাই হয় না।

কিন্তু এত উল্লাস ও প্রাণের বিকাশের মধ্যেও একটা জিনিসের অভাব চোখে বাজে। এ উদ্দামতার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নেই। যে আনন্দ এদের শীতের ভিতর দিয়ে বরফের উপর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ভূমার অসীমত্ব নেই। বসন্তকালকে এরা আহ্বান করল সাগরস্নান দিয়ে, দেশভ্রমণ দিয়ে, শীতকালকে আমন্ত্রণ করল শীতের খেলা দিয়ে। শুধু আনন্দের অন্বেষণই যে

এদের মুখে ছাপ রেখেছে। অনেক সময়ই তার বেশী কিছু নজরে পড়ছে না। আসল কথা হচ্ছে এই যে, অবিরাম আনন্দলিপ্সা সাধারণ লোকের জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন এনে দিচ্ছে।

এখানে একটি বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় বুঝলাম যে, সে কোন দিন চিন্তাশীল বলে খ্যাতি লাভ করতে পারত, কিন্তু লঘু আনন্দের দাবি তার জীবনকে অন্য দিকে গতি দিচ্ছে। সে একটি নবীন লেখক। কিন্তু জীবিকা-অর্জনের পর বিশ্রামটুকু সে রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে মগ্ন থেকে কাটানোর চেয়ে সাগরতরঙ্গে মগ্ন হয়ে কাটানো বেশী আকর্ষণীয় মনে করে। সে বলে যে, দিনের বেলার বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রকে গভীর রাত্রে সে গেঁথে তুলতে পারে বটে; কিন্তু যৌবনের আহ্বান তার কাছে প্রবল হয়ে উঠে সবকিছুকে মূল্যহীন করে দিচ্ছে।

জীবন্ত মানুষ সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়; সিদ্ধির পথে যে সাধনার প্রয়োজন তার জন্য খুব বেশী ত্যাগ সে স্বীকার করতে চায় না। সে ত্যাগ পরে হবে; যে-কোন সময় হতে পারে; কিন্তু যৌবন-সরসীনীরে এই অবগাহন "আজি যে রজনী যায়" শুধু সেটুকুর জন্যই যে। ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে সে ক্ষতি স্বীকার করবে কেন? একটি প্রাচীন ইংরেজ গ্রাম্য কবির কবিতা উদ্ধৃত করে হেসে বলল, "What had my youth with ambition to do?"

অস্বীকার করতে পারি না যে, তার কথাও কম সত্য নয়। আজ যে নেশা চোখে রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে, মাত্র কয় বছর পরেই তা ধূসর হয়ে যাবে বলে যদি কেউ আজকের মুহূর্তটিকে নিঃশেষে উপভোগ করে নিতে চায় তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। আজকের দিনের আনন্দ কি কালকের অনাগত সাফল্যের চেয়ে কম মূল্যবান?

কিন্তু নীরব খ্যাতিহীন মিল্টন—যে ফুটিলেও ফুটিতে পারিত—তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? চিন্তাশীলতা সর্বসাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না—সাম্যবাদী ফ্রান্স এমনকি সমাজবাদী রুশিয়াতেও নয়।

অবশ্য ইয়োরোপে এমন লোক যথেষ্ট আছেন যাঁরা ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য তাঁদের চিন্তার আশ্রম থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে বা নৃত্যশালায় চলে আসেন এবং তারপর আবার এই জগৎকে পিছনে ফেলে রেখে যান। ঠিক এই রকম সামঞ্জস্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে পাই না। ইয়োরোপীয়ের চোখের

সামনে typical অর্থাৎ বিশেষত্বমূলক ভারতীয় বলতে ফকির- বা মহারাজ -চিত্র ফুটে ওঠে। ভারতবর্ষের কৌপীন ও মুকুট সম্বন্ধেই তাদের যা কিছু ধারণার পরিচয় যখন তখন পাওয়া যায়। সে কথা অস্বীকারই বা করা যায় কি করে?

ছেলেবেলায় গল্প শুনলাম, বিলাসী জমিদার লালাবাবু উদাস-করা সন্ধ্যায় একটি বালিকার অনির্দিষ্ট আহ্বানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। অপরিণত মনের মধ্যে বিশেষরূপে বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ সুদূর দুটি চরিত্রের ছাপ পড়ে গেল। ইতিহাসেও রাজা ও রাজ্যের উত্থান-পতন এবং বৈরাগ্যময় ধর্মগুলির অভ্যুদয় ও বিলয়ের কথাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে পড়লাম। জাহাজের পানশালার কাণ্ড দেখে দেশের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে, আমরা মদ খাই না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা খায় তারা সাধারণত তাল সামলাতে পারে না। আমরা প্রাণের প্রাচুর্যে স্বচ্ছন্দ আনন্দ করতে অভ্যস্ত হই না, সেজন্য ভেসে যাওয়ার ভয় বেশী।

জাহাজে বার বার মনে হয়েছিল যে আমরা ভোগ ও ত্যাগ এ দুইটির মধ্যে কোন অবিরোধী অবস্থা সহজে কল্পনা করতে চাই না। নিজের কথাও ভাবতে হয়েছিল—ইয়োরোপীয় জীবনে অনভ্যস্ত ভারতবর্ষের ছাত্র ঐশ্বর্যময় আকর্ষণমদির ইয়োরোপের স্বাধীনতার মধ্যে এসে কোন্ পথে চলে যাবে? সমুদ্রযাত্রায় তরঙ্গের তাণ্ডবলীলা দেখবার জন্যই যে ঘোরাপথে উত্তাল বিস্কে উপসাগর দিয়ে ইংলণ্ডে যাবার সংকল্প করল তার খেয়ালী দুঃসাহসী মন কতখানি সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে?

ইয়োরোপের সামঞ্জস্যময় জীবনের একটি উদাহরণ এই শীতের খেলার মধ্যে পেলাম। আমার পরিচিত এক প্রবীণ মনীষী এখানে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এই তুষার-সমুদ্রে কোন যুবকেরই প্রভেদ নেই। তিনি কখনও আমাদের দেশের সর্বদা গাম্ভীর্যে লুপ্তপ্রায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের মত থাকেন না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি তাঁকে সর্বদাই আমাদের কাছ থেকে পৃথক্ করে রাখে। আমরা বেশ জানতাম এবং সসম্মানে স্বীকার করতাম যে, তিনি আমাদের বয়স্য নন, বন্ধু। এইখানে তাঁর উল্লাস দেখে কোন ভারতীয়ের মনে হবে যে, তিনি একজন প্রবীণ জ্ঞানের সাধক?

ইয়োরোপের আলোকে আমাদের ধাতকে চূড়ান্তবাদী অর্থাৎ extremist বলে প্রকাশিত হতে দেখলাম।

নিত্য জার্মানি

পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মত জার্মানি গত মহাসমরের চিতাভস্ম থেকে পুনর্জীবন লাভ করেছে।*

এ কথা জার্মানিতে মাত্র একদিনের জন্য এলেও মনে না হয়ে যাবে না। দিকে দিকে নানাভাবে নব-জীবনের উৎসাহ ও উল্লাস। ঠিক গ্রীষ্মকালে উত্তর-মেরুতে তুষার গলে সলিলসমুদ্র-সৃষ্টির মত। শীতের স্তব্ধ মৃত্যু বা নিরুপায় অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই। গত মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ও লজ্জা জার্মানির মুখ থেকে মুছে গেছে। জাতীয় জীবনে এসেছে অসীম যৌবন, অতুলনীয় বসন্ত। রাইনল্যাণ্ডে জার্মান সৈন্যের অভিযান, সারের পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন; ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি একে একে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার—এই সব আলোচনা প্রত্যেককেই উৎসাহিত করে রাখে।

মিউনিক মিউজিয়মে বিশ্রামমগ্ন গ্রীক-দেবতা স্যাটারের একটি মূর্তি আছে। তার সঙ্গে তুলনা করে মিউনিকের অধিবাসীরা বলে, "আমাদের দেশ ঐ রকম করে ঘুমোচ্ছিল এতদিন; তা বলে তার সুদৃঢ় মাংসপেশীবহুল দেহ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল মনে কোরো না।" সেই নিদ্রিত দেবতার জার্মানিতে জাগরণ হয়েছে।

ইয়োরোপে প্রাণ সর্বদাই গতিশীল। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দূর ভবিষ্যতের দিকে, গৌরব থেকে নব গৌরবের অভিমুখে তার চিরযাত্রা। তবু বহু ইয়োরোপীয় দেশে অতীতের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ ও দুর্বলতার আভাস পাওয়া যায় এবং ভ্রমণকারীরাও সাধারণত জীবন্ত বর্তমানের চেয়ে অতীতের গৌরব বেশী দেখে বেড়ায়। কিন্তু বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টি পড়ে জার্মানির পুরাতন ঐশ্বর্যের দিকে তত নয়, যতটা নবীন জার্মানির অপরূপ মহাপ্লাবনের দিকে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গৌরবের স্বপ্নের দুঃসহ আনন্দে দেশ বিভোর।

কলোনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গির্জাটি জার্মানির অন্যতম গৌরব। কিন্তু কলোনে এসে দেখলাম যে তার চেয়ে বড় গৌরবস্থল হয়েছে এখানকার ব্রাউন-

*যুদ্ধপূর্বের হিটলার-যুগের জার্মানি।

শার্টের দেশ। সেদিন একজন নাৎসী নায়ক বালক-বাহিনীর কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করতে আসছেন; সেজন্য লোকের কী বিস্ময়কর চঞ্চলতা ও উত্তেজনা! পথের দুই পাশে গৃহে গৃহে জয়পতাকা, নাৎসী অভিবাদনের সমারোহ। অসংখ্যশিখরকন্টকিত মন্দিরটিতে দেবোপাসনার সমারোহ নেই। এমনকি, অভ্যন্তরের শান্তসমাহিত বিশালতার ছায়া বহিরজনের উদ্দামতার উত্তেজনাকে একটুও স্নিগ্ধ বা সংযত করতে পারছে না। ধর্মের স্থান অধিকার করেছে দেশপ্রেম। নবজাগরণের কোলাহলে মন্ত্রপাঠের গম্ভীর নির্ঘোষ ডুবে গেছে। ক্রুশচিহ্নের স্থান অধিকার করেছে স্বস্তিক-চিহ্ন।

জার্মানির ইতিহাস হচ্ছে প্রধানত ব্যক্তির ইতিহাস। যুগে যুগে দেশের অধঃপতন ও মোহনিদ্রা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্ধার করবার জন্য, দেশকে জাগাবার জন্য কোন অতিমানব পাঞ্চজন্য বাজিয়েছেন। বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে দেশের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। এই সব সময়ে এক-একটি আন্দোলন মূর্তি লাভ করেছে। দেশের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন লুথার, ফ্রেডেরিক, বিসমার্ক, হিটলার। আর কোন দেশে ব্যক্তি-বিশেষরা এই রকম সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেন নি। জার্মান-প্রতিভা গণতন্ত্রের মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করে না, করে নেতার মধ্যে। ধর্মের আন্দোলন সৃষ্টি করলেন লুথার; সাম্রাজ্যের কল্পনাকে প্রথম প্রাণ দিলেন ফ্রেডেরিক; জার্মান সাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন বিসমার্ক, আর তৃতীয় রাষ্ট্রের স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র হিটলার। জাতীয় জীবনের বিকাশ হয়েছে এদেশে ব্যষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে নয়।

জীবনগঙ্গার এই নব ভগীরথকে বাদ দিয়ে তৃতীয় দশকের জার্মানি কল্পনা করাই অসম্ভব। ঔদ্ধত্য, অত্যাচার ও রক্তপাতের ভিতর দিয়ে তাঁর বিজয়-অভিযান হয়েছে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আসনে। কিন্তু নাৎসীরা বলে যে এইটাই দেশের মুক্তিস্বরূপ হয়েছে। বিচ্ছিন্ন, দলবিভক্ত, অপমানিত দেশের অন্য কোন উপায় ছিল না। অন্য কোন পথে তার হৃত সম্মানের এত শীঘ্র পুনরুদ্ধার হতে পারত না।

সামান্যভাবেই নাৎসী দলের প্রধান অভিযান হয়েছিল। মিউনিকে এক সময় তাদের চেষ্টা অতি সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় যেখানে প্রথম নাৎসী নিহত হয় সেখানে অনির্বাণ অগ্নি রক্ষা করা হয়। জার্মানির এই একটি নূতন তীর্থ। প্রত্যেক পথচারীকে সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে হয়

নাৎসী-অভিবাদন করে। ইহুদী ও সমাজতন্ত্রবাদীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও বহিষ্কার; ধর্ম ও সাহিত্যকে পঙ্গু করে দেওয়া; নাৎসীবাদের বিরোধীদের বন্দীশিবিরে অনির্দিষ্টকাল অবিচারে অন্তরীণ করে রাখা; বার বার জগতের শান্তি নাশের সমূহ আশঙ্কা ঘটানো—এই সব হচ্ছে জগৎকে নাৎসী জার্মানির দান। তবু দেশকে তারা যা দিয়েছে, তা স্মরণ করে জার্মানি এই বীর আত্মাগুলির প্রতি সসম্মানে বাহু প্রসারিত করতে বাধ্য হবে।

জগতে কোন বিপ্লবের পথই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; ফ্রান্স ও রুশিয়া তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ফরাসী-বিপ্লব দেড় শত বৎসরের ও রুশ-বিপ্লব মাত্র পঁচিশ বৎসরের পুরাতন। যে সব অত্যাচারের পর আন্তর্জাতিক শান্তি সহানুভূতির কথা বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আদিম মানবের প্রবৃত্তির পরিবর্তন হয় নি।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জার্মানির সুদৃঢ়। এই বিশ্বাসের বলেই সে তার প্রাপ্য স্থান ফিরে পাচ্ছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে যে রণহুঙ্কার ও বাগাড়ম্বর প্রকাশ পেয়েছে তা একটুও নিষ্ফল বা নিরর্থক নয়। ব্যায়ামচর্চার রীতি ব্রিটেনে শ্রেষ্ঠ না জার্মানিতে, তা নিয়ে তর্ক উঠেছে। যদিও কোন জাতিই নিজের পন্থাকে অপকৃষ্ট বলে স্বীকার করবে না, নিপুণতা ও শৃঙ্খলায় জার্মান রীতি জগতে ভীতি ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অলিম্পিক ক্রীড়াতে যেরূপে জার্মানি উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করছে তাতে ভবিষ্যতে কোন দেশই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। স্কুলে ব্যায়াম একটি শিক্ষার বিষয়। ইউনিভার্সিটির শ্রেষ্ঠ শিক্ষার আগে শরীরচর্চায় কুশলতা দাবি করা হয়। ব্যবসায়েও এর প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে।

দেশের প্রতি কোণটিকে এরা গভীর প্রীতি ও সহানুভূতির চোখে দেখতে শিখেছে। দেশ বলতে কোন ভৌগোলিক মৃত্তিকাখণ্ড মনে করে নি, তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের প্রত্যেকটি অংশে, বনে উপবনে পর্বতে বেড়িয়ে তার সঙ্গে নিবিড় চাক্ষুষ পরিচয় করছে। শ্রেষ্ঠ "গ্লোব ট্রটারে"র জাতি ভূ-পর্যটক থেকে স্বদেশ-পর্যটকে পরিণত হয়েছে। মোটরগাড়ির প্রাচুর্যে, দেশব্যাপী রাজপথের প্রসিদ্ধিতে ও এরোপ্লেনের প্রসারে শ্রেষ্ঠ এই দেশের যুবকরা পায়ে হেঁটে দেশ দেখছে। "হ্বাণ্ডারফোগেল" আন্দোলন এদেশেই প্রথম সৃষ্টি হয়, পরে ইংলণ্ডে "ইয়ুথ হোস্টেল মুভমেণ্ট' নামে তার প্রচলন হয়। এই

পায়ে-হেঁটে বেড়ানোতে যে নিবিড় আনন্দ পেয়েছি তার সঙ্গে তুলনা কোন মামুলি প্রথায় দেশ-ভ্রমণে পাই নি।

কিন্তু ইংলণ্ড ও জার্মানির দেশ বেড়ানোতে প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডে নিছক মনের আনন্দে হাইল্যাণ্ডসের সাগরপ্রান্তে, হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জে, লেক-অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালাম। প্রকৃতির শ্যামস্পর্শ, তারকাখচিত নীলাকাশের অতন্দ্র নীরবতা, বিজন পর্বতের মৌন মহিমা মনকে সংসার ও রাজনীতির চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। ডার্বিশায়ারে প্রশুরশিখর-কণ্টকিত নির্জনতায় চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে যে চির-রহস্যের সৃষ্টি করে, দূর-দূরান্তরে সন্ধ্যাতারা যে অপলক দৃষ্টিতে আহ্বান করে, তা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্বের কথা মনে আসে না। কিন্তু জার্মানিতে "শুধু অকারণ পুলকে" আত্মহারা হবার উপায় নেই। নব-বিধান অনুসারে আল্‌প্‌সের শুধু কোন্ অঞ্চলে বেড়ান যাবে তা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

"হিটলার যুব-আন্দোলনে" যোগ দেবার সময় শপথ করতে হয়—অলসতা, স্বার্থপরতা, ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরাজয়-স্বীকারপ্রবণতার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ করতে হবে। তার ফলে রাইনবক্ষে বা প্রকৃতির যে-কোন নিভৃত অঞ্চলেই যাই না কেন—জার্মান যুবকের কানে বিজনতার বাণী নয়, এই শপথ বিবেকানন্দের অমর বাণীর মত ধ্বনিত হতে থাকে "হে জার্মান, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত।" "আনন্দের মধ্য দিয়ে শক্তি-সাধনার" সঙ্ঘ সৃষ্টি হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের ছুটি ও বিশ্রামের সময়টা আনন্দে—বলকারক আনন্দে—কাটানোর উপায়ের সন্ধান দেওয়া। শক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সব কর্ম, চিন্তা, আনন্দ ও উপভোগেরই লক্ষ্য শক্তিসঞ্চয়।

বিদেশীরা আতঙ্কে বলে, এই শক্তি-উপাসনা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নামান্তর। জার্মানরা বলে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"; আমরা শক্তির পথে মনীষার সাধনা করছি।

দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য বর্তমান জার্মানি দার্শনিক চিন্তাশীলতাকেও ক্ষুণ্ন করতে পশ্চাৎপদ হয় নি। এদের মতে মনীষার আতিশয্যে দেশে অবসাদ এসেছিল। কাজেই মানসিকতার চর্চার চেয়ে দেহচর্চারই বেশি প্রয়োজন। থাকুক শুধু সেই বিদ্যাচর্চা যার ব্যবহারিক উপকারিতা রাষ্ট্রকে বৈজ্ঞানিক সম্পদে বিভূষিত করবে। দূরে ফিরে যাক ধর্মশাস্ত্রপাঠ ও ইহুদী-সুলভ আন্তর্জাতিকতার

ব্যাখ্যা। নারী ফিরে যাক তার নিভৃত নীড়ে; পুরুষের ভিড়ে তার প্রতিযোগিতায় অকল্যাণ হবে। গার্হস্থ্য ধর্ম ও দেশকে সুস্থ সবল সন্তান দানই তার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। বহু বৎসরের কষ্টার্জিত নারী-স্বাধীনতা জার্মানিতে নারী আবার হারাচ্ছে। সভ্যতার উন্নতির ঘড়ির কাঁটাটি জার্মানি পিছিয়ে দিতে চায়। বাইবেলের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে; নূতন সংস্করণ বাইবেলে দৈহিক শক্তির প্রশংসামূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মিউনিকের ব্রাউন হাউসই জার্মানের বেথলেহেম। আর হিটলারের "আমার সংগ্রাম" বইখানিই নব-বাইবেল।

রাষ্ট্রপতির আদেশ শীতকালে বেকারদের সাহায্যের জন্য প্রতি রবিবারে মাত্র এক "কোর্সে"র খাদ্য খেয়ে বাকি অংশের দাম তুলে রাখতে হবে। সমস্ত জাতি অম্লানবদনে তা পালন করছে। সে কথা মনে না রেখে এমনি একটি "হিটলার সনটাগে" (সনটাগ—রবিবার) লাঞ্চের প্রথম পর্ব সুপ নিয়ে বসেছিলাম। তার পরই পুরা দামের এক 'বিল' এসে হাজির। তখন ব্যাপার বুঝে দাবি করলাম যে, সুপের সঙ্গে রুটিও আমার প্রাপ্য। প্রকাণ্ড এক টুকরা রুটি দিয়ে একাধিক লোকের উপযুক্ত সমস্তটা সুপ খেয়ে হিটলারীয় নিয়মরক্ষা করলাম ও সারাদিন অনাহারে রাইন-ভ্রমণের সম্ভাবনা এই কৌশলে এড়ালাম। এই অতিভোজনও নিশ্চয়ই ব্রাউন-শার্টদের অনুমোদিত হবে না!

কলোনের কোলাহলময় বাদামী বাহিনীর শোভাযাত্রার শান্তি ভঙ্গ থেকে কী বিপুল বিরতি পেলাম কবলেনৎসের স্টীমার-ভ্রমণে! একটি নব-বিবাহিত দম্পতি চলেছে মধুচন্দ্র-যাপনে। ফরাসী স্ত্রী ও জার্মান স্বামী দুই ভাষা মিলিয়ে কথা বলছে। কেউ অতুলনীয় জার্মান কফি পান করছে। এক পাশে কয়েক জন লোক মৃদুস্বরে গান ধরেছে।

এদের ভাষা বড় অদ্ভুত। লেখার অক্ষরে বিকট ও ব্যঞ্জনবহুল দেখায়; পুরুষকণ্ঠে তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ শোনায়; কিন্তু নারীকণ্ঠে যেন সুধাবর্ষণ করে।

দু ধারে পর্বতশ্রেণী, কোথাও শ্যামল, কোথাও প্রস্তর-বন্ধুর। অশান্ত পবন শিখরে খেলা করে; তার হাসির ঢেউ স্বচ্ছ জলরাশিকে চঞ্চল করে যায়। হাল্কা মেঘ দু-ধারের গিরিদুর্গগুলিকে নিয়ে খেলা করে; অক্টোবরের অনিবিড় কুহেলিকা নদীর তীরে তীরে তরুশিরে অবগুণ্ঠন রচনা করে। মনে হয় সেই রাইন— অগণিত রূপকথা যার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত, প্রতি প্রস্তর ও গিরিদুর্গের সঙ্গে জড়িত,—সেই রাইন। 'লোরলেই'য়ের মায়াসঙ্গীত শুনতে শুনতে যেখানে

নাবিকরা হাসিমুখে প্রাণ দিত, যার মোহিনী মায়ায় রাজপুত্রেরও মন ভুলেছিল, সেখানে এসে মন মুখর ও বক্ষ স্পন্দিত হয়ে উঠল।

রথেনবুর্গের প্রাচীন প্রাচীরবেষ্টিত শহরেও মনে হল বর্তমান জার্মানি থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। এদেশে এক শতাব্দী আগেও মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। প্রুশিয়ার রাজা ও অন্যান্য রাজার প্রতিবেশীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তার রাজত্ব গ্রাস করতে চেষ্টা করতেন। এই শহরেও সেই রকম অত্যাচারের বহু চিহ্ন ছড়ানো আছে। প্রস্তর-দুর্গ, পরিখা, অন্ধকার ভূগর্ভের কারাগার, বিপদ-সঙ্কেতের ঘণ্টা, বীণাবাদিনী রাজকুমারীর বীণাটি—সব মিলিয়ে মধ্যযুগের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন দুর্গতলের উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়ছিল তখন যুব-সমিতির কুচকাওয়াজের শব্দ এখনকার শান্তি ভঙ্গ করল না।

এমনি আর-একটি শান্তির আশ্রয় পাওয়া গেল, ফ্রাঙ্কফোর্টে গোটে-ভবনে। ছায়াময় স্নিগ্ধ একটি সঙ্কীর্ণ গলি। আশেপাশে জার্মানির বিখ্যাত সসেজের দোকান। পুরাতন আবহাওয়া সুন্দরভাবে বজায় রয়েছে। মনে মনে বুঝলাম, সাহিত্যগুরুর গৃহের নিকটে কোন নবীনতার ঔদ্ধত্য শোভা পাবে না।

* * * * *

ব্যাভেরিয়ার একটি পার্বত্যগ্রামে একটি উৎসব-রজনী। বহু দূরের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নরনারী এসেছে সেই উৎসবে যোগ দিতে। এই পার্বত্য প্রদেশের বৈচিত্র্যময় পোশাকে সজ্জিত হাস্যমুখী তরুণীরা পরিচিত ও অপরিচিত সকলেরই বিয়ারের গ্লাসের সঙ্গে নিজেদের গ্লাস স্পর্শ করিয়ে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করছে। সকলেরই পাত্রে সসেজ ও লাল বাঁধাকপির পাতা সিদ্ধ, এই সকল পার্বত্য লোকেদের মধ্যে আনন্দ খুব নিবিড় হয়ে উঠল। ব্যাণ্ড বাজছে, সকলে মিলে সমস্বরে 'কমিউনিটি' পল্লীসঙ্গীত করছে ও মাঝে মাঝে উঠে হাত-ধরাধরি করে নাচছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সকলেরই "পরান হল অরুণ-বরনী"।

এমন সময় সেই উৎসবের ইন্দ্রজাল ভঙ্গ করে মূর্তিমান উপদ্রবের বেশে একদল ব্রাউন-শার্ট যুবক প্রবেশ করল। তাদের দলের পোশাক এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে

আসতে একটুও দ্বিধাবোধ করল না। সামরিক 'টপবুটে'র রূঢ় শব্দে একটি মধুর স্বপ্ন যেন নিপীড়িত হয়ে মিলিয়ে গেল। তরুণীরা কিন্তু সাগ্রহে এদের আমন্ত্রণ করলেন। বুঝলাম যে, বাদামী দলই এ যুগের একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—বর্ণশ্রেষ্ঠ ও বরমাল্যপ্রাপ্ত বীর।

উজ্জ্বল তারায় ভরা নীল আকাশের তলায় গ্রাম্য পার্বত্য পথে ফিরে আসতে আসতে মনে হল—কোন্ জার্মানি মানুষের মনে শাশ্বত আসন পাবে? সহস্র রাইন-রূপকথায় স্মৃতি-বিজড়িত, বিটোফেন-হ্বাগনারের সুরঝঙ্কৃত, গ্যেটে-শীলারের জার্মানি, বা ফ্রেডেরিক, বিসমার্ক ও হিটলারের জার্মানি?

* * * * *

সে প্রশ্নের উত্তর আমাকে খুঁজে বের করতে হল না। পার্বত্য বনশ্রেণীর নির্জন সুদূরতার মধ্যে পথ হারিয়ে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। পথ হারাবার কোন কথাই ছিল না, কারণ পথ-নির্দেশক ফলক পথিপার্শ্বেই মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। কেমন করে যে তবু বিপথে গিয়ে পড়লাম তা জানি না। কিন্তু যখন সেদিকে লক্ষ্য করলাম তখন বনের মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছি ও পথ-চিহ্নের সংকেত আর পাওয়া যাচ্ছে না। কেমন করে পুরাতন পদ-চিহ্ন উদ্ধার করে নূতন করে পুরানো পথে ফিরে আসব?

সে প্রশ্নের উত্তরও আমাকে খুঁজে বের করতে হল না। ভয় কি? মন কানের কাছে শোনাতে লাগল—ভয় কি? এগিয়ে চলো, সামনে এগিয়ে চলো। পুরাতন পথে, পরিচিত পথে কে চলতে চায়? নবযুগের অভিযাত্রী তুমি, অনির্দিষ্টের অভিমুখে করো জয়যাত্রা, করো উন্মুক্ত অজ্ঞাতের যবনিকা। এগিয়ে চলো যেমন করে এগিয়ে গেছে এই বিরাট জাতির বিশাল ইতিহাস।

এগিয়ে চলো—এই হচ্ছে এই দেশের ইতিহাসের মূলমন্ত্র। এক ধর্মরাজ্য-সূত্রে গ্রথিত করে দেব সারা ইয়োরোপকে; নূতন রাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা রূপ পেল পবিত্র রোম্যান সাম্রাজ্যে। নিয়তির পরিহাসে পর্বত মূষিক মাত্র প্রসব করেছিল। কারণ এটা না ছিল পবিত্র, না রোম্যান, না সাম্রাজ্য। তবু রাজ-নীতির ইতিহাসে এই আদর্শের মধ্যে আজকের এক বিশ্ব ও এক রাষ্ট্র সমন্বয়ের স্বপ্নের অঙ্কুর ছিল।

তারপর ষোড়শ শতাব্দী আরম্ভ হতে না হতে শুরু হল ধর্মসংস্কারের বিরাট অভিযান। ক্যাথলিক ধর্মাচরণের মধ্যে যা কিছু স্থবির ও মলিন হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন একজন সামান্ত যাজক। কোন যোদ্ধা বিশ্বের ইতিহাসে এই যাজকের মত স্থায়ী আসন পাবেন না। তার জয়রথ মানবকে শুধু সাময়িকভাবে পরাভূত ও নিপীড়িত করে রেখে যায়। কিন্তু মার্টিন লুথারের নব পথ খ্রীষ্টধর্মকে দিয়ে গেল নূতন রূপ ও শক্তি, এগিয়ে নিয়ে গেল নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে। অ্যাটিলার রক্তমাখা পথের চিহ্ন আজ কে খুঁজে পাবে? কিন্তু লুথারের ভক্তিময় নববিধান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

সাহিত্য ও শিল্পকলাতেও সেই এগিয়ে চলার মন্ত্রই ঘোষিত হয়েছে যুগে যুগে। গোটে ও শীলারের যুগেও এই দুই দিক্‌পাল 'ক্ল্যাসিক' সাহিত্যিকের বিশ্বপ্লাবী ভাবধারার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পেয়েছিল 'রোম্যান্টিক' নবীন সাহিত্যিকের দল। ইংলণ্ডে শেক্সপীয়ারের পর ও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পর যে শূন্যতা অথবা বিরাট সৃষ্টির অভাব অনুভূত হয়েছে জার্মান সাহিত্যে গোটের মৃত্যুর পর তেমন কোন বিচ্ছেদ অনুভূত হয় নি। জার্মান কৃষ্টিজগতে তিরোভাব আনে না অভাব, আবাহন করে আনে নব আবির্ভাবকে। তাই জার্মানির আকাশে গোটের অস্তমিত হবার আগেই ফুটে উঠল কবি হাইনের অরুণালোক।

হাইনে শুধু অতুলনীয় প্রেমগাথায় তাঁর যুগের ব্যথাকে রূপ দেন নি, মননশীলতা সে ব্যথাকে বিচিত্রভাবে বিকাশ করেছিল। সমসাময়িক ফ্রান্সের চিন্তার স্বাধীনতা উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিন্তা করতেন যে তাঁর নিজের দেশের বিগত রোম্যান্টিক যুগের শালীনতাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আলো, আরো আলোর সন্ধানে তাঁর অন্তর চির-রত ছিল। এই অন্তহীন সন্ধানই জার্মানির অন্তরে মূলমন্ত্র।

এই মন্ত্রেরই প্রেরণায় জার্মান দার্শনিকতাতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মাত্র একশ বছরের মধ্যে ক্যাণ্ট, লাইবনীজ, হেগেল, শোপেনহয়ার ও নিট্‌সের মত বিভিন্ন ভাবধারার দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছিল।

আর জার্মান সঙ্গীতশিল্পের তো কথাই নেই। বিশ্ব জুড়ে তার বৈচিত্র্য, মাধুর্য ও নব নব বিকাশের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। দূর থেকে ভেসে আসা একটা

ক্ষীণ পিয়ানোর বাজনা—বিটোফেনের একটি সোনাটা বুঝিয়ে দিল যে লোকালয়ের পথে ফিরে এসেছি।

আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিল রাজনীতি ও সমরনীতির রক্তমাখা পরিচ্ছেদগুলির ঊর্ধ্বে কোন জার্মানি মানুষের মনে নিত্য হয়ে আছে, সত্য ও শাশ্বত হয়ে আছে।

বিশ্বের পিয়ারী

জীবনের রাজপথের ঠিক উপরেই প্যারিসের 'কাফে'গুলি।

কাফেতে বসে বসেই প্যারিসের সমস্ত জীবনটার একটা বেশ সম্পূর্ণপ্রায় ও সংলগ্ন আভাস পাওয়া যাবে। কবি, শিল্পী, ছাত্র, আমোদপ্রার্থী, বিরাম সন্ধানী, সাধারণ লোক সবাই এখানে আসবে, পানপাত্রের উপর দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন আলাপ, আলোচনা, পরিচয়ও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে এসে নিজের নির্দোষ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে চলে যাওয়াও সহজ। পাত্রটি শূন্য হয়ে গেলেই 'বিল' এসে হাজির হবে না অর্থাৎ উঠে যাবার তাগিদ নেই। কর্মক্লান্ত দিবসের সমাপ্তি বা উৎসবচঞ্চল রাত্রির আরম্ভ যদি এখান থেকেই করা যায় তা 'আ লা মোদ' অর্থাৎ কায়দা-মাফিক হবে না এমন ভয় নেই; বরং বিদেশীর কল্পনায় সেইটাই আমোদের।

'কাফে' হচ্ছে ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ না থাকলে ফরাসী জীবনের উৎস এত স্বতঃস্ফুরিত হওয়া বোধ হয় সহজ হত না।

এখানে বসে বসে জীবনের শোভাযাত্রা দেখা যাক। একটি আমেরিকান ধনী এসে বসেছে, তার চোখে এই হচ্ছে পৃথিবীর কামরূপ। একটি জাপানী ছাত্রকে দেখা যাচ্ছে, সে এসেছে গণিতবিদ্যার কাশীতে। একটি পেরুর যুবকের সঙ্গে আলাপ হল, তার কাছে এই হচ্ছে চিত্রবিদ্যার খনি। এখন বাকি লোকদের চিনি না; কিন্তু একটি পাগড়ি দেখে ইয়োরোপের 'ফ্ল্যাপার'রা যা মনে করে আজকাল আমারও সে সন্দেহ হচ্ছে—অর্থাৎ, মহারাজা। (ভাগ্যে বাঙালীর শিরোভূষণ নেই!) এ জগতের গৃহদেবতা হিসাবে রাখা উচিত দা ভিঞ্চির চিত্র —ব্যাকাস।

কী বৈচিত্র্যময় সে শোভাযাত্রা! কত দেশের, কত বয়সের কত উদ্দেশ্যময় নরনারী, বিভিন্ন বেশভূষায়, ভঙ্গীতে আসছে যাচ্ছে। কারো মুখে সবিস্ময় আগ্রহ, কারো সকরুণ অতৃপ্তি। কেউ বা এসে হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে, কেউ এমন আনন্দক্লান্ত (Blase) যে কিছুই লক্ষ্য করছে না। কিন্তু কাফে 'লোরলাই'এর রূপসীর মত মোহিনী, তার আহ্বানে সাড়া দিতে হবে সবাইকে। কোন কাফেতে যাও নি? তবে প্যারিসেই সম্ভবত যাও নি। এ কথার উত্তর নেই।

ইংরেজের ঐতিহাসিক হোমের অভাব লণ্ডনে বড় অনুভব করতে হয়। তবু ইংরেজকে ও ইংরেজত্বকে এত বেশী পথে ঘাটে প্রকট দেখি যে 'হোম' যে কোথাও আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্যারিসের বিলাসকেন্দ্রে প্যারিসের আসল অধিবাসীকে আত্মপ্রকাশ করে থাকতে বড় একটা দেখি না।

যাকে দেখা যায় সেই বিদেশী। বুঝি বিদেশীই এখানে অধিবাসী। আর সে কথা অস্বীকারই বা করা যায় কি করে? প্যারিস হচ্ছে বিশ্বের মোহিনী। যত বিলাসী, ধনী, শিল্পী, স্বপ্নদ্রষ্টা—প্যারিস সবাইকে অহরহ ডাকছে, আশ্রয়ও দিচ্ছে। যে ক্রোড়পতি অর্থ-উপার্জনের জ্বর থেকে শান্তি পাবার জন্য এখানে এসেছে ও যে রাজনৈতিক নেতার মাথার উপর দাম ধরা আছে তারা দুজনেই সমানভাবে এখানে আশ্রয় পাচ্ছেন। যে রাজা হৃত সিংহাসনের শোক ভুলতে ও যে 'demi monde' তাব উপযুক্ত লীলা-নিকেতন পেতে চায় তাদের উভয়ের প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে এখানে। সবাই এখানে আসতে পারে, এমনকি যে গত যৌবনায় শঙ্করাচার্য-বর্ণিত অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্ অবস্থা হয়ে এসেছে অথবা লুভ্‌রের ফ্রানজ হালসের একটি বিখ্যাত চিত্রের বিলাস-ক্লান্ত প্রতিলিপি মুখে বহন করছে সেও এখানে এসেছে। আর এসেছে আমার মত সাধারণ বিদেশীরা যারা এই বিচিত্র পায়রার কুলায়ের বহুবিধ কূজন-আলাপন অন্ততঃ বাইরে থেকেও—হোক না দীনভাবে—শুনে যেতে চায়।

এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে, প্যারিসে ফরাসী নেই। যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বহু অংশ বিশ্বের বিনোদনে ব্যাপৃত। ফরাসীর নিজের শিল্পধারা ও বিদেশী পরিতৃপ্ত করবার প্রণালী দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদেশী হচ্ছে সুখের পায়রা, আসে বিলাস ও বিহারের জন্য। তাকে ফরাসী যা দেয় তা পণ্য হিসাবে, প্রীতির সহিত নয়। সে Folieতে সাজিয়েছে বিপণি, আপনি কিন্তু তাতে মজে নি। নিজের জন্যে আছে জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'অপেরা', থিয়েটার প্রভৃতি। ইংরেজ ব্যবসাদার হয়েছে রক্তের টানে; ফরাসী রুচির বৈশিষ্ট্যে।

এইটুকু ফরাসীদের বিশেষত্ব। সে নিজে 'শকড্' হয় না কিছুতে। তার চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য যে শিক্ষা আবহমান কাল থেকে দিয়ে আসছে তা বাইরের কাছে রোমাঞ্চকর, কিন্তু রুচিসঙ্গত নয়।

কিন্তু নিজে ফ্রান্স তার জন্য অসুবিধায় পড়ে নি। তার শিল্পরস মাত্র দেহ-বিশ্লেষ নয়, দেহবিকাশ। যা দেখে ভারতবর্ষীয় সনাতন মানদণ্ড সঙ্কোচে কুঞ্চিত

হয়ে যাবে, তার মধ্যে ফরাসী খুঁজবে আনন্দস্মৃষ্টি। একটুও আত্মবঞ্চনা নেই তাতে। শিল্প ও শ্লীলতাকে বিশ্লেষণ করে এমন করে নি যাতে সুন্দরও অশ্লীল হয়। সুন্দরকে সত্য বলে স্বীকার করে শিল্প-কৌশলে হৃদয়াবেগে সৃষ্ট রচনায় ফরাসী শিব বানিয়েছে। আমরা তাকে দেখি শুধু প্রস্তরবিশেষ। জোলা, ব্যালজাক, পল বুর্জে প্রভৃতির দেশে, কাসিনো ও পারী প্রভৃতির দেশে, আশ্চর্যের বিষয় বিদেশীরা খবর নিয়ে দেখে না যে, সম্ভোগ-স্বাধীনতা সত্ত্বেও ফরাসী গৃহ-জীবন শুধু যে সংযত তা নয়, তা সংরক্ষণশীল।

আসল কথা ফরাসী বৈঠকখানা সাজাতে জানে।

ইয়োরোপে অল্পবিস্তর সব দেশের সাধারণ লোকেরও কিছু রুচিজ্ঞান থাকে, সৌন্দর্যবোধ থাকে। লণ্ডনে তো সন্ধ্যাবেলা গৃহাভিমুখিনী ফুল না নিয়ে ঘরে ফেরে না। কিন্তু সে হচ্ছে তার নিজের ঘরের সজ্জা। ফরাসী সাজাবে বাহির, লোককে ডাকবার জন্য। কোথায় কোন্ চতুর্দশ শতাব্দীতে বা রোমান অধিকারের যুগে একটি দুর্গ ছিল, তার ধ্বংসাবশেষকে ইংলণ্ডের মত ধ্বংসের সাক্ষী করে সাজিয়ে রাখবে না। তাকে পুনর্নির্মাণ করবে সেই প্রাচীন যুগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে। তার পাশের প্রাকার ও পরিখা পর্যন্ত প্রাচীনতার সৌরভ ছড়াবে, তা না হলে ইতিহাসপ্রিয় ছাড়া অন্য বিদেশী না-ও আসতে পারে। বিলাসীকে আকর্ষণ করবার জন্য ক্ষুদ্র নগরটিতে 'কার্নেশন' ফুলের মেলা লাগিয়ে দেবে, ধার্মিকের জন্য কোন সাধুর স্মরণের সপ্তাহ। গিরিদুর্গশোভিত, পুষ্পভূষিত ফ্রান্সের একটি শহর কার্কাসনে দেখলাম ঠিক এমনি একটা ব্যাপার। এফেল টাওয়ারকে রাত্রে বিদ্যুতের মালাতে সাজানো হয় ঠিক এমনি রুচির প্ররোচনায়। নতুবা মোটরগাড়ি বিজ্ঞাপন আরো অনেক উপায়ে হতে পারতো। প্যারিসের বিশাল সুরম্য রাজপথগুলির সৃষ্টির মূলেও অনেকটা সেই ইচ্ছা।

যাক সে কথা। সে জন্যই তৈরী হোক 'শাজেলিজি'র জন্য জগৎ কৃতার্থ। এই রাজপথটি না থাকলে অনেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ, সুখময়, বিলাসবিহারটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এ তো রাজপথ নয়, এ যে রাজোদ্যান! স্পেনের শহরে শহরে একটি পথ আছে যার সার্থকতা বৈকালিক ভ্রমণে। এই 'রামব্লা'-গুলিতে বিচরণের মধ্যে একটা সম্ভ্রমময় আনন্দঘন সামাজিকতা আছে। প্যারিসের রাজপথগুলির পিছনে সামাজিকতার বালাই নেই, আছে স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য। আর কী এদের প্রসার! চৌরঙ্গী তো তুলনায় সুড়ঙ্গ মাত্র।

বাঙলাদেশের শান্ত গৃহকোণে অধ্যয়নরত নিরীহ নির্ঝঞ্ঝাট জীবন থেকে এসেছি। লক্ষ্মণের গণ্ডীরেখা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে ইয়োরোপের পথের প্রেমে মেতেছি। তাই পথে পথে কখনো মনে কখনো বা বাস্তব জীবনে অহরহ অভিযানে বের হই। মনে হয় অনাদি কাল ধরে শুধু পথ চলেছি অন্তরের আহ্বানে— অবিরাম আবহমান ধারায়। জন্ম হতে জন্মান্তরে যাবার পথ এক জীবনে পাব না। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের নিখিল মানবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি কান পেতে— দূরাগত সাগরকল্লোলের মত। এই পথে শার্লেমেনের নেপোলিয়ঁর বিজয়সেনা চলেছে, কখনো চলেছে অত্যাচারিত কৃশাঙ্গিত ব্যাস্তিল-বিজয়ী নাগরিক বিপ্লব-বাহিনী, আবার চলেছে রুশো, হ্যুগো, জোলা প্রভৃতির মনীষীবাহিনী।

ফরাসীর ইতিহাস লেখা হয়েছে প্যারিসের রাজপথে ও রাজপথপার্শ্বে কাফে ও সালোঁতে। এ তো লণ্ডনের রাজপথ নয়, সে হচ্ছে বিরাট বিরামবিহীন দৈনন্দিন জীবনস্রোতের প্রণালী; তার খাত বেয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাই, তার একটি আরম্ভ ও একটি সমাপ্তি আছে, যেখানে যাত্রা শুরু ও সারা হয়। কিন্তু এই দুটি বিন্দুর সংযোগ ঘটানো ছাড়া আর তার নিজের কোন সার্থকতা নেই। যদি বিষম ভিড় থাকে তবে সে পথ ভাল নয়, তার চেয়ে চল সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পাতালপথে চলে যাই।* অপরিচিতের যে নিত্য অভিনয় তা লণ্ডনবাসীর জন্য নয়, সে সজ্ঞানে তাতে কোন অংশ গ্রহণ করবে না।

কিন্তু আবাসের বাইরেই বেশী বাস করে ফরাসী। সে পথে পথে পরচর্চা রাজনীতি রসালাপ প্রেমাভিনয় সবই করতে পারে। তাই প্যারিসের জীবনের শত শত চিত্র বাইরেই দেখছি, মুখের ভাষায় মাথার নাড়ায় হাত-পায়ের ভঙ্গীতে দেখছি। এখানেই কত পরিচয় ও যোগাযোগ গড়ে উঠছে। চার পাশের আলাপোৎসুক লোককে সে সংযোগসূত্রে ক্ষণিকের জন্য এক করে দিচ্ছে।

ইংরেজ কিন্তু ঘরের বাইরে কথা কইবে না। তার সমাজমেলা ও প্রণয়লীলার ক্ষেত্র হচ্ছে গৃহাভ্যন্তরে, প্রমোদকাননে বা বাইরে মোটরগাড়ির নিভৃত সংগোপনে। ইংরেজ যদি ভবঘুরের মত "অ্যাডভেঞ্চার" করে তা হবে বিদেশে, কর্মচঞ্চল পরিচিত নিত্যকার রাজপথকে ক্ষণিকের জন্যও সে রঙ্গমঞ্চে পরিণত করবে না।

* আণ্ডার গ্রাউণ্ডের অন্য একটা নাম আছে tube অর্থাৎ বাঁশী; মার্কিনরা তাকে বলে sub-way অর্থাৎ উপ-পথ। দুটি-ই উপযুক্ত নাম।

তার কারণও আছে। লণ্ডনের পথে তেমন স্থাপত্য-শিল্প খুব বেশী নেই, পরিণত বা সুকুমার গঠনসৌকর্য নেই। কন্টিনেন্টের পথের মত মলিনতা যদি না থাকে তার অসাধারণতাও নেই। এ পাড়ায় যদি একটি বাড়ির রং লাল তবে জেনো যে সব বাড়ির রং লাল, সব বাড়িরই এক ভাবের তিনটি করে সামনে সিঁড়ির ধাপ অথবা দোতালায় একটি করে বারান্দা। প্রাণহীন সামঞ্জস্য সামান্যতা এনে দিয়েছে। তাই বার বার মনে হয় যে এ পথে প্রেরণা নেই, এই চিত্রে বৈচিত্র্য নেই। এখানে জনতা "লা মার্সেলে" গান করে বিপ্লবের সূত্রপাত করবে না; এরা একে একে ধীরেসুস্থে বিভিন্ন পথ দিয়ে গিয়ে পার্লামেন্টের সামনে ভিড় করে দাঁড়াবে।

মুক্ত আবহাওয়ায় আমোদ-প্রমোদের বা অবকাশ-যাপনের বন্দোবস্ত লণ্ডনে কম। বিদেশী এদেশে এসে নিজের চিত্ত বা বিত্তশক্তিতে ধনী না হলে বড় রিক্ত বোধ করবে। রেস্তোরাঁ সিনেমা থিয়েটার কন্সার্ট এসবে তুমি যেতে পার, কিন্তু পকেটে পয়সা বা লোকের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তোমার কাল কাটানো বা অবসর-বিনোদন সহজ হবে না। কিন্তু সে সীমারেখা বা অসুবিধা প্যারিসে নেই।

রেস্তোরাঁর জন্ম হয়েছিল প্যারিসে এবং ফরাসী বিদ্রোহের সময় এর প্রচুর প্রসার হয়েছিল। এখানে লোক অনায়াসে সহজ সম্বন্ধে মেলামেশা করতে পারে। বুলভার্দে, মোঁপার্নাসে বা মোঁমার্তর পাড়ায় বিদেশী ছাত্র সন্ধার কাফেতে বসে একা অনুভব করবে না। হয় কেউ হাসিতে ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে সৌহার্দ জানাবে, সারা বিশ্ব হতে আগত ল্যাটিন কোয়ার্টারের ছাত্ররা প্যারিসের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবে। আর যদি তুমি নেহাত একাই থাক, বিরাট ইতিহাস তার মুখর অতীত ও মূক ভবিষ্যৎ দিয়ে তোমার শূন্য বর্তমানকে ভরে দেবে।

কিন্তু এক হিসাবে এই পথগুলিতে ফরাসীকে মানায় না। এদের একটা জাতিগত ধারণা আছে যে ফ্রান্স হচ্ছে জগতের কেন্দ্রস্থল। এই সংকীর্ণতা ওদের রাজপথের প্রসারের সঙ্গে খাপ খায় না। ফরাসী বিদেশের ভাষা বা ইতিবৃত্ত শিখতে বিশেষ উৎসুক হয় না। তার ফলে যে ফরাসী জানে না তার অন্য কোন ইয়োরোপীয় দেশে গেলে তত অসুবিধা হয় না যত হয় ফ্রান্সে। কন্টিনেন্টে ধীরে ধীরে ইংরেজীর প্রচার ফরাসীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা ফরাসী

এখনো বুঝতে পারে না। ফরাসী নাগরিক বুদ্ধিমান্, কিন্তু সে নিজের বাইরে বিশেষ কিছু বুঝতে ব্যাকুল নয়। তার জীবনের ভারকেন্দ্র, ধ্যানের বিন্দু হচ্ছে প্যারিস। এমনকি বিদেশী টুরিস্টে চঞ্চল অথচ বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য আবহাওয়ায় বিচিত্র প্যারিসও নয়, কেবল প্যারিসের হালফ্যাশন আদবকায়দা। তার ফলে সারা ইয়োরোপে বিশেষত নারীরাজ্যে যখন হলিউডের ছাপ পড়েছে, হলিউডের হাবভাব, বিলাসীভঙ্গী সকলে অনুকরণ করছে তখনো তার লক্ষ্য একমাত্র প্যারিস।

এ অবশ্য ভালই। জগতে ছায়াচিত্রের কল্যাণে পোশাকী জীবনে বিশিষ্টতা অবশিষ্ট থাকছে না। একটি স্থানে তা সুষ্ঠু হয়ে আত্মঘোষণা করুক, পৃথিবী তাতে সমৃদ্ধতরই হবে।

Fetishism বস্তুত ফরাসী মনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মনের দিক দিয়ে তার ফল বিপুল কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। এর দ্বারা একটা রাজতন্ত্র চালানো যায়; একটা সৈন্যদলও চলে চমৎকার। কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়, উপযুক্ত তো নয়ই। ফরাসী রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন না হলে রাজনীতিক তরণী অনির্দিষ্টকাল কাণ্ডারীবিহনে চলে কি করে?

ফ্রান্সের রাষ্ট্রটি আছে শুধু সিভিল সার্ভিসের কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রীরা যায় আর আসে; কিন্তু টেনিসনের ঝরনাটির মত সিভিল সার্ভিসের কর্মস্রোত অক্ষুণ্ণভাবে বয়ে যাচ্ছে। তবু রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রনীতির কর্ণধার নেই। ফ্রান্সে হিটলার না হোক এক জন রুজভেল্টও নেই। এদেশে সবদিকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন। ফ্রান্সে অভাব ব্যক্তির।

কেউ কেউ ইতিহাসের বর্তমান যুগের আরম্ভ গণনা করেন ফরাসী বিদ্রোহ থেকে। এ সম্বন্ধে, বলা বাহুল্য, নানা মুনির নানা মত হতে বাধ্য। সম্ভবতঃ কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক গত রুশবিপ্লব থেকেই বর্তমান কাল গণনা করবেন। তা হলে আমাদের সমবয়সীদের জন্ম হয়েছে মধ্যযুগে এবং মৃত্যু হবে বর্তমানের শুভ আহ্বানের পর। কিন্তু বর্তমান কাল যে চিরকালই এগিয়ে এগিয়ে নূতন বর্তমানে রূপান্তরিত হবে সে সম্বন্ধে তর্ক না করলেও চিন্তা ও রাজনীতির জগতে ফরাসী বিদ্রোহের দান অসামান্য। সে বিদ্রোহের রঙ্গমঞ্চ ছিল এই প্যারিস।

এখনো সাহিত্য ও ইতিহাসের পাতায় পরিচিত পথে পথে ঘুরবার সময় কোন কল্পনাভারাক্রান্ত অন্ধকার রাত্রে 'তুলেরি' বা বাস্তিলের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানবাত্মার বিপুল নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি বুঝি শুনতে পাওয়া যাবে। কী বিরাট সে প্লাবন যার স্রোতে পরাক্রান্ত বুর্বনের (Bourbon) সিংহাসন ভেসে গেল; রূপসী রানী মারী আঁতোয়ানেঁতের সুচারু কেশরাশি এক রাত্রিতে শুভ্র হয়ে গেল। মানবের জাগরণের রঙ্গমঞ্চ এই প্যারিস। তার সঙ্গে সঙ্গে কত রক্তস্রোত ও যুদ্ধবিগ্রহ গেল এর উপর দিয়ে; প্যারিসের চোখে কত দিন নিদ্রা নেই; গৃহদ্বারে শত্রু বার বার হানা দিয়েছে। তবু প্যারিস চির রুচিরা।

অন্তর তার শিল্পরসাপ্লুত। ফ্রান্সকে হারিয়ে বিসমার্ক হরণ করলেন অর্থ ও দেশ; যার জের গত মহাযুদ্ধেও কাটল না। কিন্তু ইতালিকে পরাজিত করে নেপোলিয় আনলেন মূল্যহীন শিল্পসম্পদ্ যার জন্য ইতালি নিশ্চয়ই ক্ষমতা থাকলেও আবার যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হত না। দস্যুতা যদি করতে হয় এমন বস্তুই হরণ করতে হয় যা গলার হার হয়ে, কণ্ঠের কণ্টক হয়ে নয়, বিরাজ করবে। কর্সিকায় জন্মগ্রহণ করলেও নেপোলিয়ঁর হৃদয় ছিল ফরাসী। ফরাসীরা তাঁকে হৃদয়েই রেখেছে। লুভ্‌র তিনি তৈরী করেন নি, কিন্তু একে শিল্পের স্বপ্নকানন করে গেছেন তিনিই।

লুভ্‌র এর পরিচয় দেবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ছোটখাট অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত চিত্রশালা বা বিদ্যাপীঠের অভাব নেই এখানে। লুক্সেমবার্গে যে বিদেশী যায় না সে ঠকে বলতে হবে। এমনি আরো কত আছে। ত্রকাদেরোর উপর অনেকের নজর প্রথম পড়ে যখন রাত্রের আলোয় তা বিভূষিত হয়। আমাদের দেশে Sorbonne-এর নাম অনেকে জানেন না, অথচ ইয়োরোপের কত মনীষী এখানে বিদ্যা সম্পূর্ণ করবার জন্য আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। জ্ঞানের আলো যে যুগে ছিল অস্ফুট ও প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ, ধর্ম যে যুগে বিদ্যাকে ক্ষুণ্ণ ও আচ্ছন্ন করতে দ্বিধা বোধ করত না, তখনো এখানে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হতে বিদ্যার জন্য জনসমাগম হয়েছে। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ইয়োরোপের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

অনেক দূর হলেও ভার্সাইকে প্যারিস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজসমারোহ ও বিলাসের দিক দিয়ে ভার্সাই ছিল প্যারিসের সম্পূরক। এখানকার বিরাট প্রাসাদের চারিদিকে দিগ্বলয় যে শ্যাম অরণ্যানীর

সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন তার মধ্যে চতুর্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের মূর্তি লুকিয়ে আছে। এত রূপ ও পাপ, ঐশ্বর্য ও ষড়যন্ত্র, বিলাস ও বিফলতা বুঝি ইয়োরোপে আর কোথাও ছিল না। কত সুন্দরীর নৃত্যচটুল চরণাঘাতে এ প্রাসাদের মর্মর এইমাত্র বুঝি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যেতে বাতাসে কলহাস্যের আভাস এখনি ভেসে আসতে পারে; লালসার অতৃপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস বুঝি এই ক্ষুধার্ত পাষাণে লেলিহান শিখা বিস্তার করে স্পর্শ রেখে গেছে।

ক্ষণে ক্ষণে শাহ্‌জাহানের দিল্লীর কথা মনে পড়ে। রাজরোষ ও রাজপ্রসাদ ছিল দিবসের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় সংবাদ। বংশ-সম্ভ্রম বা পরাক্রম তার তুলনায় নগণ্য ছিল। সমারোহ ও রাজসম্মান ছিল জীবনের ধ্রুবতারা। সমরকুশলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপ্রিয়তা বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশগুলির ভিতরে ঘুণ ধরে জাতীয় জীবন যাচ্ছিল অধঃপাতে। তাই বিলাসে, শিল্পকলাতে, সমারোহের উজ্জ্বলতায় যে গরিমার প্রকাশ ছিল তা অস্তরাগ মাত্র। ভার্সাই তারই দীপ্তি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাষ্ট্র বলতে বোঝাত রাজা; এবং চতুর্দশ লুই ছিলেন "বুর্বন" ফ্রান্সের শাহ্‌জাহান।

প্যারিসকে চিনে রাখা খুব সহজ। ভিক্তর হ্যুগোর পাতায় পাতায় তার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছে তা কি ভোলবার? বা তাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে? 'নোতাব্‌দাম'কে কে না চিনতে পারবে ও তার ঘণ্টানির্ঘোষ একবার শুনলে দূরান্তরে সে ধ্বনি কার কানে না প্রতিধ্বনিত হবে সময়ে সময়ে? যে সীন নদী সর্পিল গতিতে নগরীকে বেষ্টন করে রেখেছে, যে প্রশান্ত উদ্যান ও প্রশস্ত রাজপথ তার সম্পদ্, তাদের কোন্ বিদেশী ভুলে যাবে? এমনকি, যার পরিচয় মাত্র এক রাত্রির চিন্তাহীন উৎসবের ভিতর দিয়ে সেও একে চিরদিন স্মরণ রাখবে।

চোখে যা দেখা হল তার চেয়ে শতগুণ বেশী অনুভব হল মনে, সহস্র গুণ পরিচয় স্বপ্নে। ফরাসী যাকে বলে flaner সেই লীলা বুঝি প্যারীর বাতাসে ভেসে আসে; ক্ষণিকের অতিথিতেও তার চঞ্চলতা সঞ্চারিত করে দিয়ে যায়।

লুভ্‌র থেকে একবার মোনালিসার ছবিটি চুরি গিয়েছিল। ফরাসী জাতির এতবড় সর্বনাশ আর কিছুতে হয় নি এমন ধরনের তাতে তোলপাড়

হয়েছিল। পরে সেটিকে পাওয়া গেল, কিন্তু ছবির অধরোষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

চোরের অদ্ভুত মনোবৃত্তির কথা বাদ দিয়েও বুঝতে পারা যাবে এ অত্যাচারটা শিল্পীর চিত্রসার্থকতার প্রতি কত বড় সম্মান।

এই গল্প লুভ্‌রের একজন চিত্রকর-যশঃপ্রার্থী বললেন। গল্পটি কিন্তু শ্রদ্ধার বাণীর মত শোনাল। মনোবিকারের ভিতর দিয়েও চোরের শিল্পরসিকতা লোপ পায় নি। এ চোর নিশ্চয়ই ফরাসী।

ফরাসীর অন্তরের বাহিরটা বড় মুক্ত, বড় উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে আন্তরিক বন্ধু হতে পারে না সহজে, কিন্তু বন্ধুত্বের উত্তাপ তার মধ্যে আছে। এই চিত্রকর-পিয়োকোন্দার যে প্রতিকৃতি আঁকছিলেন তার জন্য বিদেশীর একটি সামান্য কবিতাও গ্রহণ করলেন—

কখন হাসিয়া গেছ একবিন্দু আনন্দের হাসি
ভুবনে অতুল,
আজিও পড়িছে তাহা কত রূপে কত নবভাবে
কবি শিল্পীকুল,
কখন মুছিয়া যায় আমাদের সুখশান্তিভরা
দুদিনের হাসি,
তোমার হাসিরে ঘিরে আজিও এ তৃপ্তিহীন ধরা
উঠিছে উচ্ছ্বাসি।

ক্ষীণ চন্দ্রালোক ও কুয়াশায় মাখা পারী হচ্ছে রাত্রির পরী। মৃদু আলোকে একটি রহস্যময় হাসির কথা মনে পড়ছে। সে হাসি একটি চিত্রে আবদ্ধ না থেকে সমস্ত নগরীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এ কি আনন্দ, না বিষাদ? এ তো শুধু পারী নয়, এ যে বিশ্বের পিয়ারী। "তুমি কারে কর না প্রার্থনা"—স্বর্গের অপ্সরারই মত। তোমার তীর্থে কত বিভিন্ন রসাস্বাদনের জন্য মধুমত্ত ভৃঙ্গসম লোক আসছে আবহমান কাল থেকে—কিন্তু তাদের কারো পরিচয় বা হিসাব তুমি রাখ না। অনিত্য জীবনের পাত্রে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিত্যকাল যে সুন্দরী সুধা ঢেলে চলেছে তার কারো দিকে তাকাবার সময় কোথায়? তাই পারীতে শুধু অগণন পথিক আসে আর যায়, কিন্তু পারী কারো সন্ধান রাখে না। এ তীর্থে কখনো লোকাভাব হবে না।

"[illegible] তোমার [illegible]-জ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান।"

পথে বিপথে

এই সময়ে ইংলণ্ডে থাকা উচিত। এপ্রিলের পাদস্পর্শে সারা দেশ জেগে উঠছে বয়ঃসন্ধিকালের মত। কোন সকালে জেগে উঠে দেখব যে, অলক্ষিতে এল্‌ম্‌ গাছের শাখায় কোথায় ছোট ছোট পাতা দেখা দিয়েছে আর আপেলের কুঞ্জে কোন পাখি প্রথম ডাকতে আরম্ভ করেছে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে, মনেও পড়েছে নাড়া। দিনের পর দিন কোথায় নূতন নূতন ফুল ফুটে উঠেছে; কতটুকু বর্ণপরিবর্তন হল মাসের মধ্যে, সে সন্ধানে নয়ন আপনি ঘুরতে থাকে। এপিং-এর উপবনে বা রিচমণ্ডের উদ্যানে কোন্ কোনায় কোকিলের ডাক প্রথম শোনা গেল তার বিবরণ লোকের মুখে মুখে, কাগজের পাতায় পাতায়। প্রকৃতির জাগরণে সংস্কৃত কবিদের যে উল্লাস তারই আভাস পাই এই কর্মব্যস্ত বিষয়ী ইংলণ্ডের জীবনে।

এরা প্রকৃতিকে দেখছে সংস্কৃত কবির আনন্দ দিয়ে, আবেগ দিয়ে নয়। এদের চোখ ও মন পৃথক। ব্যবহারিক জীবন দিয়ে তাকে অনুভব করতে চায়, ধরণীর ধূলিতে তার চরণস্পর্শ খোঁজে, আকাশের স্পর্শহীন প্রাপ্তির অতীত নীলিমায় নয়। মার্চ এপ্রিলে এরা পদব্রজেই দিগ্বিজয় করতে বের হল। সাঁতার কেটে, নৌকা বেয়ে, মুক্ত প্রান্তরে নেচে, হেসে খেলে প্রকৃতির সংবর্ধনা করল। সঙ্গে সঙ্গে মাতল মন, জাগল জীবন। ঘরে ঘরে ফুলের শোভা দেখা গেল, আর তার সঙ্গে বহির্মুখী জীবনের লীলা। প্রকৃতি জেগেছে, তাই স্বতন্ত্রভাবে এরাও জাগল কিন্তু তার মধ্যে আত্মোবিলোপ করল না। মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি, জীবনের উপমা এরা প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়ায় না। এরা প্রিয়ার হস্তে লীলাকমল, অলকে বালকুন্দ, কর্ণে শিরীষ ও মেখলাতে নবনীপের মালা সাজিয়ে দেয় না। ইয়োরোপা বড় জোর হরিণাক্ষী; অথবা মরালকণ্ঠী, অথবা রক্তগোলাপ; কিন্তু তাকে ফুলসজ্জায় সাজিয়ে ফুলশয্যায় পাঠাবে না ইয়োরোপের কবি।

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥"

এমন কথাটি তার মনে আসবে না। তার মানসী মুকুরের সামনে মুখে মাখে রাসায়নিক প্রসাধনী, শুভ্র লোধ্ররেণু নয়।

আপনার সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিজড়িত করে প্রকৃতিকে ইয়োরোপ আপনার মনে করে না। শকুন্তলাবিরহকাতর বনভূমি ইয়োরোপের মাটিতে নেই। ভবভূতির রামের সান্ত্বনাস্থল হবে না এখানকার নিভৃত উপবনগুলি। এগুলি জীবনের উল্লাসের, অনুভবের নয়, বিহারক্ষেত্র। এখানে মানুষ প্রকৃতিকে সাজিয়েছে ও সম্ভোগ করেছে, তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আত্মবিলোপ করে নি। তার সঙ্গে পরিচয় করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তার কাছে আসে সেবকের বিনয় নিয়ে নয়, বিজয়ীর ভোগস্পৃহা নিয়ে।

প্রকৃতি পর্যাপ্ত হলেই প্রগতি সাধারণত আড়ষ্ট হয়। যা জয় করে নিতে হয় না, যাকে হারাবার ভয় নেই, তার জন্য কে কবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে? এবং যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিতে না হলে কেই বা আপনাকে সবল করে রাখতে চায়? তাই সুখের দান পেয়ে পেয়ে আমরা ভারতবর্ষে অবল ও অলস হয়ে গেছি। আমাদের উত্তাপের দেশে জন্ম হচ্ছে অগণিত। মানুষ গণনা করি কোটি দিয়ে, মনুষ্যেতরকে তো গণনাই করি না। তাই মানুষের জীবন যেমন ক্ষীণ, মৃত্যুও তেমন সুলভ। বলতে কি, জন্ম ও মৃত্যু যেহেতু বিধাতার ব্যাপার, মানুষ তাতে হস্তক্ষেপই করতে চায় না। লক্ষ লক্ষ জন্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত, জীবনও লক্ষ্যহীন। ওপারের চিত্র কিন্তু অন্যরকম। প্রতি কীটপতঙ্গের জীবনের ধারা ও ইতিহাস লক্ষিত ও লিখিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি ফুলের নাম, গন্ধ ও বর্ণ লোকে জানে। রুচি ও সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে তাদের স্থান অতি উচ্চে। আমাদের দেশের মত এদের সার্থকতা শুধু কবিপ্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করে না। সার্থক জন্ম এদেশের ফুলের।

শুধু ফুল? সমস্তটা জীবনই তো ফুলের মত শোভা ও সুরভিতে বিকশিত করে তুলতে পারা যায়। চারিদিকে হাসিমুখ, সুস্থ সবল দেহ, উৎসাহিত মন দেখতে পাই। পায়ে অপরূপ গতিভঙ্গিমা, চোখে স্বপ্ন ও মাথায় সোনার ঐশ্বর্য নিয়ে কতজনকে যেতে দেখেছি। পূর্ব উপকূলের একটি ডাবুর শহরে ছুটি

কাটাচ্ছি। একজনকেও দেখছি না যাকে মনে মনে কোন ফুলের নামে না ভূষিত করতে পারি। একটি শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মুখকে নাম দিলাম 'লিলি হোয়াইট', একটি লাজুক কিশোরকে 'স্নোড্রপ'; আর আড়ম্বরময় একজনকে 'রোডোডেনড্রন'। শেষোক্তকে 'স্ন্যাপড্রাগন' বললেও চলে।

বসন্তের প্রথম মাদকতাটুকু উপভোগ করতে ক্যেস্টারে এসেছি, কারণ এখানে ভারতীয় কেউ আসে বলে জানা নেই। পায়ের ও মনের শৃঙ্খল খুলে গেছে, তাই হতে চাই মুক্ত, সব দিক থেকে, নিজের পরিচয়ের হাত থেকেও। অপরিচিতের সঙ্গে চাই পরিচয়, নিঃসঙ্গের সঙ্গে বিশ্রব্ধ আলাপ। আমার বাইরে আমি আসব নিঃসঙ্কোচে, কারণ কেউ আমার অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে আঘাত করবে না; ও অপরিচয়তাকে অক্ষুণ্ণই রাখব। ব্যবহারিক সভ্যতার মুখোশ খোলার এই প্রশস্ত স্থল পেয়েছি।

সারি সারি ছোট ছোট তাঁবু খাটানো আছে, এতখানি দূরে দূরে যেন নির্জনতা না ভঙ্গ হয়। কোথাও পরিত্যক্ত ট্রামগাড়ি একখানা রয়েছে রথিবিহীন বিদ্যুৎরথের মত। তাতেই লোক থাকতে পারে। ঘরবাড়ির বালাই নেই; দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকতে হবে না। কবি ও কবি-বন্ধু 'বাহাত্তুরে' স্যাথ্ দুজনেই এখানে একবয়সী এবং পরস্পরের কাছে সংকোচহীন। আপাতত আমার তাঁবুতে তিনটি কিশোরের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছে,—এদের কাছে এটাই লুকোচুরি খেলার খুব সুবিধাজনক জায়গা মনে হয়েছে। এরা থাকে একটা ট্রামে মায়ের সঙ্গে, দিন কাটায় হৈ-চৈ ও স্ফূর্তি করে; আমাদের 'হলিডে ক্যাম্পে' এদের কেই বা না চেনে?

এখানে সবরকম ও সবশ্রেণীর লোক এসেছে তাদের নিজ নিজ পরিচয় পিছনে ফেলে, সকলের সঙ্গে সমান হয়ে, নিজের ইংরেজসুলভ স্বভাবের কোণীয়তা (angularity) ঘষে মেজে ঠিক করে নিয়ে। আত্মগোপনকারী রোমান্টিক ধনিসন্তান বা ক্যামডেন টাউনের কেরানী যে-কারো সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে চাই তা বর্ষার ধারার মত স্বচ্ছন্দে উৎসারিত হবে; তার কর্মজীবনের মাহাত্ম্য বা লঘুভার পরিচয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। কেউ মনে করিয়ে দেবে না যে সে ব্রাহ্মণবংশাবতংস ও তার সঙ্গে কৌতুক অবাঞ্ছনীয়। এখানে যারা এসেছে তারা সকলেই মুক্ত মন ও স্বচ্ছ স্বভাব নিয়ে এসেছে সাময়িকভাবে। উদার আকাশ ও অসীম সাগরের সজলজলের

সূর্যের সামনে, কৃত্রিম সভ্যতার আরাম ও আবেষ্টনের বাইরে আনন্দপূর্ণিমায় যারা মিলিত হয়েছে তাদের মধ্যে দাম্ভিকতা ও সংকীর্ণতার কথা আসতেই পারে না। এই হচ্ছে আমাদের স্বভাবের স্থিতিস্থাপকতার পরিচয়।

প্রাতরাশের পর থেকেই দিন যে কি করে কাটবে তার ঠিক পাই না। এত ভাবে এত পথে তা কাটানো যায়। জনতা ও বিজনতা উভয়েরই বাণী কানে এসে পৌছায়। কোথাও একটি দল ফুটবল খেলছে, কোথাও অন্যান্য খেলা। বালুবেলায় ছেলেমেয়েরা রঙীন রবারের বল নিয়ে হাতাহাতি করছে ও আছাড় খেয়ে নাকাল হচ্ছে। স্নানপ্রিয়রা ঢেউয়ের তালে তালে জলে নাচছে। একটি দল বসনহীনতার প্রায় কাছাকাছি এসে (দিগম্বর নয়) নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান করতে করতে সাগর-সম্মেলনে যাচ্ছে। তারা চায় জনতা। কেউ বা একা একা রৌদ্রদাহ উপভোগ করছে, যে যত পোড় খাবে সে ততই লণ্ডনে ফিরে গেলে আকর্ষণীয় হবে। সবাই ঈর্ষায় ও প্রশংসায় তার দিকে তাকিয়ে ভাববে যে, সে দস্তুরমত একটা ছুটি উপভোগ করে এসেছে। দলে দলে লোক দূরে বালুকায় দেহ রক্ষা করে রৌদ্রের দান গ্রহণ করছে। এদেশে মাত্র চার-পাঁচ মাস ভাল করে সূর্যদেবতা দেখা দেন, তাই তাঁর কিরণধারা সঞ্চয় করে রাখবার এত আগ্রহ। সবাই আশ্চর্য হয়ে ভাবে ভারতীয়ের দেহে কি প্রচুর পরিমাণেই না সূর্যোত্তাপ সংগৃহীত আছে। সেইজন্যই বুঝি গরম দেশ থেকে আসা সত্ত্বেও তার প্রথম প্রথম শীত করে কম।

আর যদি ইচ্ছা হয় ওই বিস্তীর্ণ বালুবেলায় একাকী উপলবন্ধুর পথে সাগর-জল স্পর্শ করতে করতে বহুদূর চলে যেতে পারব। মনে মনে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' আবৃত্তি করতে করতে যাব। হয়তো কারো সঙ্গে দেখা হয়ে বিজনতা ভঙ্গ হবে না, হয়তো কেউ শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে নীরবে চলে যাবে, হয়তো কেউ জিজ্ঞাসা করবে, "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

এই একটি প্রশ্নে কত প্রশ্ন ও কত প্রশ্নের অতীত কথার আভাস মনের মধ্যে ভেসে উঠতে পারে। কল্পনার স্রোত বাঁধ ভেঙে ছুটে চলে। কোন্ অজানা জায়গায়, কোন্ হঠাৎ-দেখা সরাইয়ে, কোন্ বিজন গোলাপলতা বিতানে-ছাওয়া গলিপথে তন্বুগাত্রী নীলনয়না কনককেশিনী কপালকুণ্ডলা নিমেষের তরে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাবে। তখন, তখন হয়তো।

"চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"

অথবা কখনো হয়তো সাগরের কোলাহল ত্যাগ করে নগরের লোকালয় বেশী ভাল লাগবে। আপেলকুঞ্জ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত ইংলণ্ডের দৃশ্য দেখতে পাব ও মন পুলকিত হয়ে উঠবে। কত কবিতায় এর বর্ণনা; কত নিবিড় পরিচয়, কত সুকুমার সৌন্দর্য দিয়ে এ দৃশ্যকে সাহিত্যে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ভূমিখণ্ডের বর্ণনা দিয়ে তাকে অন্যটি থেকে পৃথক্ করে বেছে নিতে পারব, কারণ এদেশের স্থানবর্ণনায় কবিপ্রসিদ্ধির বালাই নেই। এরা নিজের অন্তর দিয়ে নিজের দেশের স্নিগ্ধ সৌকুমার্যটুকু দেখতে পারে; এমনিভাবে একটি লোকালয়কে দেখবার ইচ্ছা হল হয়তো কখনো।

"Sweet William with his homely cottage-smell
And stocks in fragrant blow,
Roses that down the alleys shine afar
And open jasmine-muffled lattices,
And groups under the dreaming garden trees,
And the full moon, and the white evening star."

Jasmine muffled lattices—এইটুকুতেই সৌন্দর্যময় সুশোভন ইংলণ্ড মূর্তি ধারণ করে প্রাণময় হয়ে ওঠে।

নর্ফোক ব্রড্‌সের নীতি হচ্ছে—"মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে"। জলে স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছাবিহারের শ্রেষ্ঠস্থান হচ্ছে এখানে। পাল তুলে নৌকা (yacht) সপসপ করে শান্ত স্বচ্ছ জলরাশির উপর দিয়ে চলে যাবে। দুধারে ধানের শীষের মত লম্বা লম্বা জলঘাস। তার ভিতর দিয়ে সরসর করে বাতাস বয়ে নৌকায় শুভ্র শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। নৌকার পালের ছায়ায় বসে ডেকচেয়ারে একখানি বই নিয়ে অথবা উদার দিগন্তের দিকে আঁখি মেলে বা নিমীলিত রেখে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। আহারের উপকরণের জন্য স্থলে যেতে হবে না। কোথাও না কোথাও জলেই নৌকায় দোকান ভাসছে। তীরে তরী এনে স্বপ্নভঙ্গ করতে হবে না। কোন তৃণাচ্ছাদনের মধ্যে একটি বক, কোন বাঁধের অন্তরালে প্রাচীন সময়ের চিহ্নস্বরূপ একটি 'উইণ্ড-মিল' দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কল্পনার পাল দিয়ে তাকে

উদ্দামগতিতে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যে যত বেশী কর্মক্লান্ত, যত বেশী অর্থের সন্ধান ও সাশ্রয়ে বিজড়িত, রক্তকরবীর রাজার মত যে যত বেশী স্বর্ণ শৃঙ্খলিত, সে সাময়িক মুক্তিকামী হলে তার কাছে ব্রড্‌স্ তত বেশী বিরামস্থল বলে মনে হবে। নিস্তরঙ্গ নির্ভয় জলরাশি যে শান্তিপ্রলেপ দেয় তার তুলনা সহজে মেলে না। সবচেয়ে ভাল লাগে সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা ও ব্যবহারিক সামাজিকতার অভাব। সেজন্যেই যে সব ধনীরা এখানে আসেন তাঁদের বিনিষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলতে হবে। এখানে যে রকম খরচ পড়ে তাতে তাঁরা সম্ভ্রান্ত বিলাসের স্থলে গেলেও পারতেন।

এখানে এলে পূর্ববঙ্গের জলভরা ধানক্ষেতের কথা মনে হবেই। কিন্তু এই জলরাশির মধ্যে বিজড়িত নেই দরিদ্র কৃষকের আশা ও আশঙ্কা এবং কুটীরবাসীর সামান্য কুটীরের নিরাপত্তার সমস্যা। আর-একটি অভাব আছে যার জন্য এই ব্রড্‌স্‌কে যথেষ্ট পরিমাণে রোমাণ্টিক মনে করতে পারলাম না। একটি চক্রবাকমিথুন সুকোমল শষ্পরাজি ও স্বচ্ছ জলরাশিকে পরিপূর্ণ একটা রূপ দিতে পারত। সে কথা বিশেষ করে মনে হয় যখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেও নীচে নৌকার ভিতরে নেমে আসার প্রয়োজন থাকে না, সারাদিনের লক্ষ্যহীন ব্যাঘাতহীন জলবিহারের আনন্দের উপর একটা অকারণ ও পরিচয়হীন অব্যক্ত বিষাদ ছায়াপাত করে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটুকুকে, সমস্ত আকাশখানিকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই জলের উপর যে শুভ্র শান্ত সুপ্তপ্রায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে তাকেও অন্তরে না নিলে সারাটি দিনের উজ্জ্বল আলোকে সম্পূর্ণতা দান করা যাবে না।

সমস্ত দেশটার বসন্তকালটুকুকে স্পর্শ করে অনুভব করবার জন্য একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠছে। বইয়ের পাতা থেকে গাছের পাতার দিকে কতবার মন চলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। লাইব্রেরির বিজলী আলো থেকে চোখ বার বার বাইরের ম্লান সূর্যালোকের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এ সময়ে পরীক্ষার কথা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যেন অপরাধ, যেন অপবিত্রতা।

ঘরের ও বাইরের, কর্তব্যের ও প্রকৃতির দোটানায় পড়ে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় হচ্ছে সন্ধিস্থাপন করা। আমিও তাই করলাম। সপ্তাহে সাড়ে পাঁচদিন কাজ ও দেড়দিন অকাজ। দেশে থাকতে এতটা

অকাজের কথা কল্পনা করতেও ভয় করত ও বহু হিতৈষীর হিতবচন বর্ষণের ভয় থাকত।

এখানে কেউ নেই; স্বেচ্ছাবিহারের সুবিধা সুলভ, পথও প্রচুর। কাজেই শনিবার হলেই ছুটি ও বেরিয়ে পড়া। তার ফলে পড়াও ভাল হতে লাগল। পুরস্কার হয়তো পিছনেই আসছে একথা মনে ভেবে পরিশ্রমেও উৎসাহ পাওয়া যায়। আর ছুটির পরে কাজে যে মনোযোগ ও উৎসাহ দেখা দিতে লাগল তা দেশে কখনো অনুভব করি নি। দেহেও ক্লান্তি রইল না, মনে রইল না অশান্তি।

কোন কোন দিন বেরিয়ে যেতাম ঘোড়া চড়ে। লণ্ডনের বাইরে বহুদূর ট্রেনে গিয়ে একজায়গায় নেমে পড়া যেত। বনে বনে অশ্বারোহণের আনন্দ হত অপরিসীম। প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন নব যৌবন এনে দিত সর্বদা। কখনো পথে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, কখনো সারাদিন আমার বন্ধু একমাত্র এই চতুষ্পদ। বনের বিজনতা নগরের জনতার পরে বড় মধুর ঠেকতে লাগল।

কখনো কয়েকজনে মিলে মোটরে যাওয়া যেত। এমনি একটা অভিযান হল উত্তর ওয়েল্‌সের পার্বত্য অঞ্চলে। কোন কোন জায়গায় শিলং-পথের মত সংকীর্ণ চড়াই ও উতরাই: কিন্তু সে পথের শ্যামসৌন্দর্য এখানে ছিল না। এখানে ছিল প্রস্তরপথ আর রসহীন প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে অগণন ফুলের সৌন্দর্য। পার্বত্য স্কটল্যাণ্ড ও পার্বত্য ওয়েল্‌সের রং বিভিন্ন। প্রথমটি শ্যামল ও অযত্নবর্ধিত, দ্বিতীয়টি ধূসর ও সুসজ্জিত। ওয়েল্‌স্ বেশী সভ্য ও কথা বলে কম।

সাধারণভাবে ভ্রমণও কম হতে লাগল না। প্রায় সপ্তাহেই পায়ে হেঁটে কোথাও না কোথাও যেতে পারতাম। অবশ্য শহরতলির পর বেশ কয়েক মাইল ট্রেনে পার হয়ে যেতে হত, কারণ ইংলণ্ডে নগর গ্রামকে ক্রমশ গ্রাস করছে ও ভবিষ্যতে গ্রাম বলতে শহরের সাধারণ সংস্করণ মাত্র বোঝাবে। কত ছোট ছোট অজ্ঞাতপূর্ব গ্রামকে নিজের আবিষ্কারের আনন্দে নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত দেখলাম। কত সামান্য হ্রদ, সাধারণ উপবন ও প্রাচীন গির্জাকে, ওয়ার্ডস্বার্থের অনুকরণে দেখতে চেষ্টা ও ইচ্ছা করলাম। "The joy of widest commonalty spread"-এর আনন্দ কতদিন কত তুচ্ছ জিনিসে অনুভব করলাম যা আর এক সময়ে হয়তো হাস্যকর মনে হবে।

মাঝে মাঝে অপ্রিয় প্রসঙ্গও উঠে পড়ত। একদিন একজন সঙ্গী মিস

মেয়োর বইয়ের উল্লেখ করল ও সে নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেল। তখন একথাও মনে পড়ল আমাদের দেশের কত অভিভাবক এদেশের 'মায়া-রাক্ষসী'র প্রভাবের জন্য সতত শঙ্কিত থাকেন। আমাদের কোন কোন লোক যদি ওদের সম্বন্ধে বিশিষ্ট অন্যায় ধারণা পোষণ করতে পারে, ওরাও তেমন ভুল ও অন্যায় করতে পারে। প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে যারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তাদের শুধু দোষ দিলেই হবে না। যে সামাজিক অবরোধ ও অন্ধকার থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা ও তীব্র আলোকের মধ্যে তারা এসে পড়ে তাকেও দোষী করতে হবে। এদেশে তো আর 'মায়ারাক্ষসী'তে পরিপূর্ণ নয়। কজনই বা এই কৃষ্ণকলির দেশের বিদেশীদের গিলে খাবার জন্য রসনায় ধার দিতে চাইবে? আমরা দেশ থেকে যে সব গল্প শুনে থাকি সেগুলি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

আর আমাদের মধ্যেই কি খারাপ আছে কম? বরং সেগুলি আরো বেশী নগ্ন, অসহায় ও অশোভনভাবে চোখের সামনে বিরাজ করছে। কতবার একথা মনে হয়েছে যে, যেখানে ধর্ম দয়াহীন, সমাজ ক্ষমাহীন ও মানুষ মানুষের প্রতি উদাসীন, বৈরাগ্য যেখানে আলস্যে আবরণ ও ক্ষমা দুর্বলতার আভরণ, সেখানে ইংলণ্ডের এত বেশী নিন্দালোচনা ঠিক শোভন নয়। বরং তার গুণাবলীর দিকে বেশী মনোযোগ দিলে অনেক উপকার হতে পারে।

সবচেয়ে বেশী একথা মনে রাখা উচিত যে, যারা এত উন্নতি করেছে, যাদের এত পৃথিবীবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য—এমনকি, আমাদের সনাতন-ধর্ম ও ব্রহ্মচর্যের দেশের উপরেও ছিল যাদের এত ঐশ্বর্য ও প্রসার, এত সাহিত্য ও সুকুমার কলা, সে জাতির এই উন্নতি অসচ্চরিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দোষদর্শী হওয়ার চেয়ে গুণগ্রাহী হওয়ায় লাভ আছে।

আবার কটি দিন একটানা ছুটি কাটাতে বের হওয়া গেল। ভারতবর্ষীয় গ্রামোন্নতির জন্য একটি সমিতি আছে ইংলণ্ডে; তারই বার্ষিক অধিবেশন হবে।

অবশ্য আমার উদ্দেশ্য গ্রামসভা নয়; গ্রাম্যশোভা। অতি সুন্দর প্রাসাদে আনন্দের সঙ্গে শহরের আরাম পাওয়া গেল। সৌন্দর্যপ্রিয়ের জাতি এরা। তাই সভার অধিবেশন হবে এমন সুন্দর গৃহে ও সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে। সকালবেলা থ্রাসের কূজন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়, আর কতদূরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। সবুজ প্রান্তরের মধ্যে হঠাৎ একটি

স্রোতস্বিনী মিলবে। কোথাও বৃহদাকার গোরু চরছে। কোথাও একটি চাষা যাচ্ছে। এক জায়গায় কাটা গাছের গুঁড়ির উপর একটি শিশু বসানো হয়েছে। চারিদিকে একটা সম্পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির আভাস পাই যার অভাব আমাদের দেশে বড় কষ্ট দেয়। কাছেই এক জায়গাতে একটি কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করা আছে। তার ভিতর সুড়ঙ্গপথে ছোট রেলগাড়ি চলছে; কিছু পয়সা দিয়ে তাতে চড়া যাবে। সারাদিন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকা সহজ। সমিতির কথা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে না, কারণ মন রয়েছে গৃহাভ্যন্তরে নয়, মুক্ত প্রান্তরে।

একটু আগে এক জায়গায় গ্রাম্য-সঙ্গীত শুনে এসেছি; গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে community singing করেছে; সহজ ভাব, সরল সুর সে গানের। তাদের সম্মান গ্রামে ও প্রকৃতির চোখে; নগরের সুশিক্ষিত গীতিনিপুণ সুরশিল্পীর কাছে তাদের বিশেষ দাম নেই। কিন্তু সন্ধ্যার দীর্ঘায়মান ছায়ার মধ্যে এই গানগুলি আমার মনকে আকর্ষণ করেছে; ওয়ার্ডস্বার্থের হাইল্যাণ্ডবাসিনী একাকিনী কৃষকবালিকার গানের মত আমার মনকে কোন্ সুদূরের আহ্বান শুনিয়েছে।

সেখানে তারা ভারতবর্ষীয় গান শুনতে চেয়েছিল; কিন্তু আমাদের পল্লী-সঙ্গীত লোপ পাচ্ছে ও শহরে সামান্য কয়জন গীতশ্রী ও বাকি সকলে গীতহীন হয়। কাজেই ভারতীয় কণ্ঠ তাদের কোন আনন্দ দেবার আয়োজন করতে পারল না। আমাদের যে নিরানন্দের দেশ!

এমনি করে হার্ফোর্ডশায়ারের সেই গ্রামটিতে আনন্দের মধ্যে এক-একটি দিন সম্পূর্ণ শতদলের মত বিকশিত হতে লাগল। ফুলে ফুলে মাটি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 'ড্যাফোডিলের' স্নিগ্ধতায় অন্তর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। 'হেজের' লতাগুল্মের পাশ দিয়ে হাঁটতে গেলেই পাখি পিছন থেকে ডাকে, ঝোপের স্পর্শ যেন আটকিয়ে রাখতে চায়। গর্সের সুবাসে রাত্রের অনিদ্রা আকুল করে ও নিদ্রা নিবিড় হয়ে ওঠে। বার বার বুঝতে পারি—

ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান-রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন।

রূপসী ইটালিয়া

রেনেসাঁসে মানুষ পৃথিবীকে ও নিজেকে আবিষ্কার করল। এর দ্বিতীয়টির মধ্যে পাই শিল্প ও কৃষ্টির একটা অনুরূপ ও অতুলনীয় আবির্ভাব। মানবের ও পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় উদ্বোধন আর হয় নি। মানবতার গৌরবগাথা এমন করে আর কখনো গাওয়া হয় নি। "দেবতারা অলিম্পাস থেকে নেমে এসে আবার মানুষের মধ্যে বাস করলেন।"

এই নবজীবনের ধারা জার্মানিতে আনল ধর্মজাগরণ আর ইটালিতে চারুশিল্পের জাগরণ।

ইটালির চোখের রং বদলে গেল। রিক্ত বঞ্চিত ক্ষুধার্ত তপশ্চর্যা থেকে পূর্ণ ভোগময় ঐশ্বর্যময় আনন্দঘন প্রাণধারণের প্রণালী। তার সঙ্গে সঙ্গে জীবন-নদীতে বর্ষার প্লাবনের মত অনেক শ্যাওলা ভেসে এল। একটা প্রবাদ আছে যে, বাজলে শহরে একটি গির্জার তোরণে খোদাই করা ছিল যে মৃত আত্মারা শেষ বিচারের দিন কবর থেকে উঠে তাড়াতাড়ি পোশাক পরছে। তার একশত বছর পরে ইটালিতে পোপের কবরের উপর ব্রোঞ্জের নগ্ন নারীমূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীতে নিয়মই এই। ক্রিয়ার পরে নিয়তির ন্যায় অমোঘ প্রতিক্রিয়া।

একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে মধ্যযুগে মানব আধিভৌতিক চিন্তায় মগ্ন ছিল; অসহিষ্ণু যাজক সম্প্রদায় ও সংকীর্ণ জ্ঞানমার্গ আদিম অনুভব ও তার সহজ সুন্দর প্রকাশকে কণ্ঠরোধ করে রাখছিল। তবুও ইয়োরোপের রূপপিপাসা ও কাব্যজিজ্ঞাসা একেবারে বন্ধ হয় নি। তাই কবি ও শিল্পীরা সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না রেখে বার বার আন্তরিক অনুরাগ ও জীবন উপভোগের স্পৃহা নিয়ে 'শিভ্যালরি' ও রহস্যময়তার অবগুণ্ঠন ভেদ করে মধ্যযুগের মধ্যে স্বাভাবিকতার আলো আনবার চেষ্টা করছিলেন।

সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। নবজাগরণের ঊষায় মানবতা সেই বিদ্যাকে দশ শতাব্দীর শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি দিল। মানবকে যুক্তিসহ আকাঙ্ক্ষাময় পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকারী বলে স্বীকার করে স্বর্গের অলীক স্বপ্ন ও নরকের অলৌকিক ভীতির হাত থেকে উদ্ধার করে আনল। তার মনীষাকে মুমূর্ষু যাজকশিক্ষা

ও গতানুগতিক শাস্ত্রচর্চার বাইরে রূপ যৌবন ও স্বাধীনতার অভিব্যক্তি করবার মত ক্ষমতা দান করল। বিদ্যাচর্চার বাসনা আর আশ্রমবাসীর বা শ্রেণীবিশেষের একান্ত অধিকার হয়ে রইল না, অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মিশে গিয়ে সমস্ত সমাজকে রোম্যান্সের আবেগে পরিপূর্ণ করে দিল। স্থাপত্যশিল্প ধর্মমন্দিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইহলোকের দিকে আকৃষ্ট হয়ে নবজাগরণের অগ্রদূতরা ভৌগোলিক সীমারেখা লোপ করে নবপৃথিবী আবিষ্কার করল।

প্রাচীন বিদ্যার এক নবীন সাধক এই সময়ে বলেছিলেন, "আমি যাচ্ছি মৃতকে জাগাতে।" কিন্তু মৃতকে জাগিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না। তারা জীবিতকে স্বীকার করল, ধুলার ধরণীকে সুন্দর আনন্দময় বলে আবিষ্কার করল। আধুনিক সভ্যতার সেই মোহিনী উষায় বেঁচে থাকা ভগবানের আশীর্বাদ বলে পরিগণিত হল আর যৌবন হল স্বর্গসুখ। পার্থিব সুখ ও পেগান ভোগ যে ক্ষণস্থায়ী, দৃষ্টিগোচর ইহকাল যে অদৃষ্ট পরকালেরই প্রতীক ও মানবজন্ম যে পরজন্মের জন্য প্রস্তুত হবার সময় এ সব বিজ্ঞ নিষেধবাণী নৃত্যচটুল চরণ ও সঙ্গীতোচ্ছল কণ্ঠকে আর বাধা দিতে পারল না।

যা কিছু সুন্দর তাই ইটালিতে শাশ্বত হয়ে উঠল। বহুনিন্দিত, দীর্ঘকাল অনাদৃত মানবদেহ পবিত্র দেবতার ধন হয়ে উঠল। মানবের অনুভব অতিমানবের মহিমায় শুদ্ধ বলে বিবেচিত হল। রূপকথার ও দেবগাথার নায়ক-নায়িকারা যে মানুষের মত ব্যবহার করবেন সেকথা প্রকাশে ধর্মহানির ভয় রইল না। ধর্মের শাসন এড়িয়ে শিল্পের সাধনা সম্ভব ছিল না, তবু গির্জার পৃষ্ঠপোষকতায়ও শিল্প জেগে উঠল। প্রিয়ার প্রতিলিপি দেবীর আলেখ্যের মধ্য দিয়ে ফুটে বের হল, দেবীর মূর্তি প্রিয়াতে পর্যবসিত হল। বৈষ্ণব কবিতার সেই অমর ব্যাখ্যা—

"আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।"

এই বাণী যেন রেনেসাঁসের মর্মকথার প্রতিধ্বনি। মানুষকে দেবভক্তির আন্তরিকতা দিয়ে ও দেবতাকে মানবপ্রেমের অন্তরঙ্গতা দিয়ে শিল্পীরা দেখলেন ও আঁকলেন। তার ফলে ইটালির চিত্রে আমরা পাই প্রকৃত মানুষের প্রতিমূর্তি,—তা সে দেবতারূপেই হোক বা মানবরূপেই হোক।

ফ্লোরেন্সের উফ্‌ফিৎসি (Uffizi) প্রাসাদে এই কথাই বার বার মনে হতে লাগল। বেচারী আন্দ্রিয়া দেল সার্তোর সব চিত্রেই একটি নারী; নানা আবেষ্টনে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বিষয়ে শুধু সেই এক নারী। দেখে মনে করা একটুও কঠিন নয় কে সেই ভাগ্যবতী। শিল্পীর জীবন কিন্তু ছিল বড় করুণ। প্রথম জীবনে আন্দ্রিয়ার র‍্যাফেল প্রভৃতি সমকক্ষ প্রতিভা ছিল। কিন্তু সে প্রতিভার বিকাশ প্রিয়ার রূপপাশে আড়ষ্ট হয়ে রইল। তিনি লুক্রিজিয়া ছাড়া কাউকে 'মডেল' করবেন না; তার জন্য নিজের ক্ষমতার অপচয় ও প্রতিভার অপব্যবহারও করতে কুণ্ঠিত হলেন না। শিল্পী হিসাবে পরাজয়ের বেদনাকে দ্বিগুণ করে তুলল এই আবিষ্কার যে, প্রিয়া তাঁর শিল্পে কোন প্রেরণা জাগাতে পারেন না।

ব্রাউনিং-এর একটি কবিতায় তাঁর জীবনাকাশের করুণ আভাটুকু বড় সুন্দর করে ফোটানো হয়েছে। লুক্রিজিয়া (লুক্রিশ) গোপন প্রণয়ীর অভিসারে যাবার জন্য ব্যাকুল, অথচ তখনো আন্দ্রিয়া ভাবছেন তারই কথা। ইহলোকের ওপারে হয়তো তিনি আর-একবার র‍্যাফেল, লিওনার্দো, এঞ্জেলো প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবেন কিন্তু একথাও ভাবছেন যে, পরাজয়ই তাঁর অদৃষ্টে অখণ্ডনীয়, কারণ প্রেয়সী তখনো যে পাশেই থাকবেন।*

চিত্র-প্রতিলিপির কল্যাণে আজীবন ফ্লোরেন্সের সঙ্গে পরিচিত হয়েও একে রূপকথার রাজপুরী বলে মনে হচ্ছে। এত তার মাধুরী, এত রোমান্স। পিত্তি প্রাসাদে র‍্যাফেলের 'ম্যাডোনা' দেখে ছেলেবেলার কথা মনে হল; পায়ের তলার কাঁটা তুলে ফেলেছে যে প্রস্তরে গড়া বালক তাকে ডাকতে ইচ্ছা হল। 'উফ্‌ফিৎসি' থেকে 'পিত্তি'তে আসবার পথে 'আর্নো' নদীর উপরে "ভেচ্চো" সেতুর উপরের প্রাচীন বস্ত্র ও অলঙ্কারের দোকানগুলিকেও চিত্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে হল। মনে পড়ল "দান্তের স্বপ্নের" রূপকচিত্রটির কথা, যেখানে 'পপি' ফুলগুলি হচ্ছে নিদ্রা ও মহানিদ্রা; নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ হচ্ছে বিগতপ্রায় প্রাণ, আর দেবশিশুবাহিত লঘুশ্বেত মেঘ বিয়াত্রিচের আত্মা।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে। উত্তরকালের প্রায় অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ এই প্রণয়কে করুণ স্মৃতিমাত্র করে তোলে।

* শিল্পী Greuze-এর 'ভগ্নকলস' চিত্রের কাহিনীও অনেকটা এমনি করুণ। তাঁরও জীবনে শিল্পপ্রতিমা ও প্রাণপ্রেয়সী একই নারীতে পাবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রীতির সকরুণ স্মৃতি যে স্বর্গীয় সুর সৃষ্টি করে ধরাতেই অমরাবতী রচনা করতে পারে তার অতুলনীয় উদাহরণ পাই দান্তের জীবনীতে। ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র নয় বছর বয়সে দান্তে তাঁর প্রাণের প্রেরণাকে নয় বছর বয়সের বালিকার মূর্তিতে প্রকাশিত হতে দেখলেন।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সাংসারিক হিসাব প্রাপ্তির অতীত থেকেই বিয়াত্রিচে পরলোকে চলে গেলেন। কিন্তু ইটালির শ্রেষ্ঠ কবি তখনি কাব্যগাথায় তাঁর মৃতা প্রেয়সীর বন্দনাগান গেয়ে উঠলেন। তিনি একটি মোহন স্বপ্ন দেখলেন যাব ফলে তিনি ঠিক করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি এই বরাননকে উপযুক্ত-ভাবে বর্ণনা করতে না পারবেন ততদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখবেন না। হে পরম স্রষ্টা, তোমার প্রসাদেই জীবন পৃথিবীতে আসে। তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমার জীবন আরো কয়েক বছর এ পৃথিবীতে থাকে যাতে আমি তার সম্বন্ধে এমনভাবে লিখতে পারি যা এর আগে কোন নারী সম্বন্ধে লিখিত হয় নি। তারপর, হে প্রভু, আমাকে তুমি এখান থেকে টেনে নিয়ো যাতে আমি পুণ্যাত্মা বিয়াত্রিচের বরানন দর্শনমহোৎসব লাভ করি, ঠিক যেমন করে সে এখন পরাৎপর পরমেশ্বরের দর্শন পাচ্ছে। "ভিটা নুয়োভা"র নবজীবনীগাথাতে অনন্ত জীবনের যে আভাস, অসীম প্রেমের যে আবেগ পাই বিশ্বসাহিত্যে তার স্থান চিরকাল থাকবে।

আর দান্তের এই প্রেমকাহিনীতে প্রেম যত প্রেরণা দিয়েছে কবিকে, সংযম ও সাধনা তাঁকে তার চেয়ে কম সৌন্দর্য ও অনির্বচনীয়তা দেয় নি। আমাদের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের পলকে প্রকাশের জীবনধারাতে দান্তের শিক্ষার ও সহিষ্ণুতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কে এর নাম দিয়েছিল ফ্লোরেন্স? এমন মধুর নাম ছাড়া একে আর কিছুতেই মানাত না। Duomor (গির্জা) বাহিরটা যেন স্বপ্নে দেখা একটা কারুকার্য ; আর তারই উপযুক্ত Campanile (ঘণ্টাঘর) হচ্ছে পাশের বর্ণবৈচিত্র্যময় স্তম্ভটি। Baptistryর (দীক্ষাস্থানের) তিনপাশের তিনটি দরজা দেখে মাইকেল এঞ্জেলো স্বর্গতোরণের উপযুক্ত বলেছিলেন। গির্জার উপর থেকে শহরের যে দৃশ্য পাওয়া যায় তা এক কথায় অপূর্ব।

রূপের আদর্শ কী?

আমাদের সকলেরই মনের গহন অতলে স্বপ্নসঙ্গিনী বা নিখিল মানসরঙ্গিণীর

একটি আদর্শ থাকে যাকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই মিলিয়ে যায়; যে চিরকালই আমাদের সকল প্রশ্ন ও প্রাপ্তির অতীত তীরে থাকে। তবু আদর্শ আমরা একটা রাখিই—হয় তা দেহ-সৌষ্ঠবের, বা প্রকাশভঙ্গীর বা প্রাণময়তার। তাকে বর্ণনা করে কবি, ব্যঞ্জনা দেয় শিল্পী। আবহমানকাল তাই আমরা তাদের কাছে যাই আমাদের স্বপ্নের মূর্তির, কল্পনার প্রকাশের জন্য। শিল্পের ইতিহাসে তাই দেখি অনন্ত রূপের শোভাযাত্রা।

প্রস্তরযুগে নারী ছিল বিশেষ করে বংশের জননা—যে বংশকে বরফের যুগের ইয়োরোপের নির্মম শীতের হাত থেকে জীবন রক্ষা করতে হত। তাই প্রস্তরযুগের নারী হচ্ছে স্থূলাঙ্গী বীরাঙ্গনা, শুধু গজগামিনী নয়, সাক্ষাৎ গজেন্দ্রাণী। গুহামানব গুহাগাত্রে বাইসন পশুর ছবি আঁকত বহু বাইসন শিকার-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। এতেই তার মন কিভাবে শিল্পকে গ্রহণ করেছিল তা বোঝা যাবে। যুগে যুগে পুরুষ যেভাবে তার সঙ্গিনীকে আকাঙ্ক্ষা করেছে সেভাবেই তাকে এঁকেছে, নারীও সেভাবেই পুরুষের সামনে আবির্ভূতা হয়েছে।

গ্রীক আদর্শ ছিল সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্যময় নিরবদ্য গঠনভঙ্গিমার রূপ; ভগবান যে তাঁর নিজের আকৃতিতে মানুষ গড়েছিলেন ধর্মের এই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ করে গ্রীক শিল্পীরা মানবীর আকারে দেবীকে রূপ দিলেন; তাঁদের ভিনাস হচ্ছেন স্বর্গীয় বা স্বর্গসুষমাময় নারীর শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। তাঁদের কাছে তিলোত্তমা সুন্দরী নাগরী ফ্রাইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ দেবসুন্দরীর মানবী রূপ। এ কল্পনায় তাঁরা দেশের শিল্পরসিকদের সকলেরই অন্তরের সমর্থন পেয়েছিলেন।

আর্টের স্বর্ণযুগে ইটালির পার্বত্য শহরের রূপসীরা দেবমাতা ম্যাডোনার 'মডেল' রূপে দাঁড়াল। তারাই প্রাচীন ধর্মকাহিনীর দেবীদের চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপ দিল। লিওনার্দোর 'মোনালিসা'র কথা না-ই ধরলাম, আরো অন্যান্য শিল্পীরা সবাই মানবীর মূর্তিতে দেবীকে উপলব্ধি করেছিলেন। করেজ্জিয়ো সব প্রাচীন দেবকাহিনীর ছবিতেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের ভিনাস সাজাতেন।

ফ্লেমিশ ও ডাচ শিল্পীরাও তাই করতেন। কিন্তু তাঁদের দেশের সৌন্দর্যের মানদণ্ড সকলের কাছে আকর্ষণীয় নয়; তাই রুবেন্স ও রেমব্রান্টের হাসিখুশী গিন্নীবান্নিরা কখনো সৌন্দর্যজগতে চাঞ্চল্য আনতে পারেন নি।

চিত্রশিল্পের আর একটি শতাব্দীর শিল্পী মানবীকে আঁকতে বসে দেবীর কথা ভুলেই গেলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীরা পম্পাদুর, দ্যুবারী প্রভৃতি

রাজপ্রেয়সীদের কক্ষসজ্জায় মনোনিবেশ করলেন। ইংরেজ শিল্পীপ্রধানরা অভিজাতদের চিত্ররূপ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। শেষোক্ত চিত্রগুলি এখন আমেরিকান লক্ষপতিদের আদরের সামগ্রী—কারণ এই হচ্ছে মার্কিন ধনীর পূর্বপুরুষ-পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন ও উপকরণ।

তবু তো তারা মানবী। কিন্তু চিত্ররাজ্যে আরো বহুবিধ দেবী বা মানবী প্রতিকৃতি আছে যা মানবের আকৃতিতে গঠন করা হয়েছে কি না সন্দেহ। রসেটির যুগের সারসকণ্ঠী বেত্রবতীদের আকৃতি বা বর্তমান যুগের Cubistদের নারীচিত্রের অনুকরণে যদি মানবীকে ভাবতে হয় তা হলে ভাস্করের বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি পাথরের পরিবর্তে রক্তমাংসের দেহের উপরই চালাতে হবে। রুচির বৈচিত্র্য একেই বলে।

তবু যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রুচি শিল্পধারার প্লাবন প্রতিহত করে গ্রীসের সৌন্দর্যসৃষ্টি আপন মহিমার শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়ে আসবে। মিলোর ভিনাস বা মেদিচির ভিনাস মূর্তি চিরকাল জগতে শ্রেষ্ঠ মানবীমূর্তি বলে পূজা পাবে। চকোলেট বাক্সের রূপসীমূর্তি দেখে অভ্যস্ত ও সন্তুষ্ট শিক্ষাহীন লোকেরও চোখে মূর্তি নূতন আলোকে নূতন স্বপ্নলোকের সন্ধান দেবে।

একটি ছবির কথা বাদ দিলে ফ্লোরেন্সের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। 'ভিনাসের জন্ম' ছবিটি রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্ত্রমুগ্ধ মহাসিন্ধু উচ্ছ্বসিত সহস্র উর্মিমালার ফণা অবনত করে লুটিয়ে পড়েছে চিরযৌবনার পায়ের কাছে। ভিনাস বা উর্বশী যে নামই দেওয়া যাক, শিল্পীর স্বপ্নপ্রতিমার পরিচয় সে শুধু নিজে। "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"। "বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দের" উপর 'অতি লঘুভার' চরণ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ভিনাস।

বিধিলিপি বিচিত্র। এই ঐতিহাসিক অনিন্দ্যসুন্দর গৃহগুলি চিরদিনই মানুষের আনন্দবর্ধন করে নি। বার্গেল্লো প্রাসাদটির সুন্দর অলিন্দ চিরদিনই যে শান্ত সৌন্দর্যের স্থান ছিল তা নয়। এক সময় এখানে বহু ব্যক্তি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে। এখানে মিউজিয়মে রক্ষিত বিচিত্র অস্ত্রসম্পদ্ ভিন্ন দৃশ্যের অভিনয়ে ব্যবহার করা হত। এখানে প্রথমে ছিল কারাগার, পরে হল নগর-রক্ষীদের প্রধান কার্যালয়। এমন সুন্দর প্রাসাদের সঙ্গে এমন অসুন্দর কার্যের সম্বন্ধ চিন্তা করতে একটু কষ্টবোধ হয়।

মাইকেল এঞ্জেলোর 'ব্যাকাস' দেখতে এসে একথা না মনে হয়ে যেতে পারে না। 'লনাৎসি' ভবনের তোরণে দাঁড়িয়ে আছে চেল্লিনির অমর সৃষ্টি 'Perseus'। 'ভেচ্চি' প্রাসাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বরুণদেব (Neptune); কিন্তু এই ভবন বিভিন্ন যুগে নাগরিক ভবন, কারাগার ও প্রাসাদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এখন হচ্ছে গভর্নমেন্টের অফিস। এখানেই ফ্লোরেন্সের কর্ম ও ধর্মের বীর সন্ন্যাসী সাভোনারেলা। বন্দী ছিলেন ও বাহিরের চত্বরে তাঁকে জীবন্তে অগ্নিদাহ করা হয়। অদ্ভুত ভাগ্য এই নগরের! এর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন তিনজন বিভিন্ন বিভাগের মহামানব—মাইকেল এঞ্জেলো, গ্যালিলিও ও মেকিয়াভেলি; তিনজনেরই স্মৃতি রয়েছে একই মন্দিরে।

মিলান, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে থেকেই জগতের সভ্যতাকে দিয়েছে সহস্র অবদান। এর তুলনা আধুনিক যুগের একীভূত ইটালিতে কোনদিন নাও মিলতে পারে। প্রত্যেকটি ছোট রাষ্ট্রে জনমত থাকত প্রবল ও সংহত; প্রত্যেক নাগরিকের চোখ থাকত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর। জনসাধারণের করতালির মধ্যে বন্ধুর উৎসাহ ও প্রশংসাধ্বনিত হয়ে উঠত। এভাবে উৎসাহিত ছোট রাষ্ট্রগুলির দান একটি ইটালির পরিবর্তে বহু দেশের মিলিত দানের মত সম্ভার দিয়েছে। তাই ইটালির প্রত্যেক নগরকে অনুভব করতে হবে এক-একটি দেশ হিসাবে তাদের বিভিন্ন সম্পদ ও শিল্পধারাকে একেবারে এক মনে করলে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না।

'Cosee Venice and then die'—চলচ্চিত্রের কল্যাণে এই ছবির মত সুন্দর শহরটির সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই এমন বিদেশী পাওয়া যাবে না। কিন্তু ছবি দেখে যা ধারণা হয় সেই কল্পনার ভেনিসের চেয়ে বাস্তবের ভেনিস বেশী সুন্দর। এই একটি জায়গা যেখানে "Yarrow Unvisited" এর চেয়ে "Yarrow Visited" বেশী বিস্ময় জাগায়, বেশী আনন্দ দেয়।

সমস্ত শহরটিকে রূপ দিয়েছে একটি খাল, বলয় যেমন করে বাহুলতার রূপকে বন্ধন দিয়ে ঘিরে রেখে পূর্ণতা দেয়। এই খালটিই হচ্ছে এখানকার প্রধান রাজপথ। এরই দুধারে অভিজাতদের প্রাসাদমালা। এতদিনের জলের লবণস্পর্শেও খারাপ হয়ে যায় নি। গণ্ডোলিয়ের সামনের দিকে মুখ রেখে পিছনের poppaতে দাঁড়িয়ে একটি দাঁড়ে গণ্ডোলা চালায়। যাত্রীর জন্য একটি নীচু ঘর (felze) থাকে। বেল্লিনির ছবিতে যে রকম দুধারে খোলা হালকা কাঠামোর

উপর চাপানো সোনালী পাড় ও নানারঙে সাজানো গণ্ডোলা দেখি তা আজকাল দেখা যায় না। তবু যেগুলি এখন আছে অন্তত তাতেও জলবিহার না করলে ভেনিস আসাই বৃথা।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভেনিসের রাষ্ট্রগত মূল্যের তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। প্রাচ্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইয়োরোপের প্রহরী এই ক্ষুদ্র শহরটি একটি নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করেছিল। নৌযুদ্ধের বিশারদতায় এর সমকক্ষ পাওয়া যেত না। ঐশ্বর্য ও বিলাসেও মধ্যযুগে ভেনিস ছিল ইয়োরোপের ঈর্ষা ও আদর্শ। বিভিন্ন শিল্পধারাকে আশ্রয় করে সে উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। এবং বাই-জান্টাইন, গথিক, পূর্ব-রেনেসাঁস ও উত্তর-রেনেসাঁসের কলাকৌশলকে বিভিন্ন যুগে গ্রহণ করতে ইতস্তত করে নি। সাধারণভাবে বলতে গেলে নানা প্রস্তরমণ্ডিত মোজায়েকশোভিত সেণ্ট মার্কের মন্দিরে বাইজান্টাইন শিল্প আর ঠিক তার পাশেই ডিউকের প্রাসাদে গথিক শিল্পের উদাহরণ পাই। অথচ ভেনিসের একাকিত্ব ও ইয়োরোপের প্রান্তে অবস্থিতির জন্য দুটি শিল্পধারারই বিকাশ হয়েছে আপনা থেকে। ইয়োরোপের প্রান্তেই বলতে হবে, কারণ তার দুয়ারে সতত তুরস্ক সেনাদল হানা দিয়েছে ও তুরস্ক সাম্রাজ্য পাহারা দিয়েছে। স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল বহু শতাব্দী ধরে রাজনীতিক ইতিহাসে, তেমনি ছিল শিল্পের বিকাশে। ধর্মপ্রাণতা শিল্পকে দেয় নি কোন বাধা; প্রাদেশিকতা কলঙ্কিত করে নি তার উদার মর্যাদা।

ইটালির আকাশে অনুপম নীলিমা ও 'লাগুনে'র বেগুনি আভায় মিলানো সন্ধ্যার অস্তরাগে 'ডোজের (doge) প্রাসাদের মর্মরশিল্পকে জালির সূক্ষ্মকাজ বলে ভ্রম হয়। আশেপাশের অলিগলিতে কাঁচের কারখানায় যে অপরূপ সূক্ষ্ম ও সুকুমার জিনিসগুলি তৈরি হয় সেগুলি যে এই প্রাসাদের শিল্পীদের বংশধরদেরই হাতের সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আর সুচিত্রিত চামড়ার বইয়ের ঢাকনাগুলিও যে এদেরই হাতের কাজ তাও সহজেই বোঝা যায়। শুধু শিল্পকলা নয়, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দিক দিয়েও ভেনিস অষ্টাদশ শতাব্দীর সীমার বাইরে পা বাড়াতে কুণ্ঠিত। সান মার্কের গম্বুজ ও মোজাইকের কারুকার্যের উপর যখন সন্ধ্যার ম্লান আলো. বঙ্কিম ভঙ্গীতে এসে পড়ে তখন মন্দিরচত্বরের উপর ঘনায়মান অন্ধকারে সমবেত অসম্ভবরকম লোভী পায়রার দলকে দেখে সেই কথাই মনে হয়। এদের পূর্বপুরুষরা দান্তে ও

পেত্রার্কের হাত থেকে খাবার নিয়ে খেয়েছিল. কাসানোভা যখন এখানে বসে তার অসংখ্য প্রণয়িনীর কাছে চিঠি লিখত তখন তার চারপাশে অক্লান্ত কলগুঞ্জনে বিহ্বল করে তুলত।

কাসানোভার কাহিনী হয়তো অতিরঞ্জিত। তার যুগে অত্যুক্তিই ছিল বিলাস আর বিলাসিতাই ছিল গৌরব। ভেনিসের জীবনের চিত্রকর গ্যার্দির (Guradi) ছবিতেও তারই প্রমাণ পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেনিসের বিলাসলীলা ও ছলাকলার পূর্ণ প্রতিরূপ তাঁর ছবিতে। রাষ্ট্রতন্ত্রের গম্ভীর ব্যবস্থাপক দলের চোখে অধীর ভোগলালসা, domino (ছদ্মবেশ) শোভিত মহিলাদের পাশে যোদ্ধাদের বীরত্বহীন কোমলভাব। তাস-পাশার কেন্দ্রস্থল অথবা ridottoতে (মুখোশ ঢাকা নাচে) পরচর্চা ও নৌকাবিহার সমান আনন্দ দায়ক ছিল। এই হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেনিসের ইতিহাস।

অসংযম, অসচ্চরিত্রতা ও তার আবরণস্বরূপ আড়ম্বরময় সাজসজ্জার বহরে ভারাক্রান্ত শহরের দূষিত জলের ঢেউ শুধু রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ সম্ভ্রান্তবংশগুলিকে ডুবিয়ে ক্ষান্ত হল না। গভীর রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর আশ্রম ও সন্ন্যাসিনীর মঠে গিয়ে পৌঁছাল। ভেনিসের অভিজাতরা বীরের অসি ভুলে বিলাসের বাঁশি তুলে নিলেন, এবং ইয়োরোপের যেখানে যত সুখের পায়রা ছিল সবাই এসে তাঁদের সঙ্গে মেতে গেল। গ্যার্দির ছবিগুলির মধ্যে যা আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে এই যে এত প্রাচীন গৌরবময় রাষ্ট্রতন্ত্রে যখন মৃত্যুর বিষ ধীরে ধীরে দুর্নিবারভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তখনো এই লোকদের মুখে তাদের জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতনতার ছাপ নেই।

তেমনিই অনুশোচনাও নেই এদের জীবনে। এরা কৃতকর্মের জন্য, [illegible] জীবনের জন্য অনুতাপ করবে না। ব্রাউনিংএর আর একটি কবিতা মনে পড়ে। ডিউক কার্ডিনাণ্ড রিকার্দি-বধূকে কামনা করে প্রত্যহ রিকার্দি প্রাসাদের পাশ দিয়ে যান, আর বধূ বাতায়নে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় করেন। তাঁরা পলায়নের বন্দোবস্ত করলেন, কিন্তু পালাতে পারলেন না। জীবনে তাঁদের সার হল শুধু দৃষ্টিবিনিময়।

কিন্তু হায়, যৌবনস্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী; তার ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ মিলিয়ে যেতে লাগল। প্রেমেও এল মলিনতা। সে স্বপ্ন ও সে স্মৃতিকে স্থায়ী করবার জন্য বধূ তার আবক্ষ-জানালায় ও ডিউক তাঁর প্রতিমূর্তি নীচের উদ্যানে স্থাপন করলেন। অনন্তপ্রেম

শাস্তমূর্তিতে পরিণত হল। কবি বললেন, তাঁদের জীবনে ব্যর্থতার অভিশাপ লেগেছে মিলন হয় নি বলে। প্রেমের শূন্যতা রয়ে গেল মিলনের অপূর্ণতায়। প্রদীপ জ্বালানো হয় নি, শুভযাত্রা করা হয় নি, এই হল তাঁদের জীবনে পাপ। ব্রাউনিংএর জীবনবাদে অনুশোচনার স্থান নেই—হোক না সে জীবন ভোগে মগ্ন, ভোগই যদি জীবনের আদর্শ হয়ে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয় সেই ভেনেসিয়ানরা শুধু চিত্রকরের তুলিকাতেই বিস্মৃতির গর্ভ এড়িয়ে বেঁচে রইল, যদিও সেই ভেনিস এখনও পূর্ণমাত্রায় প্রাণময়। এখানে এখন জলপথে স্টীমার চলে দুপাশের হোটেলগুলির বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিচ্ছায়ায় দোলা লাগিয়ে। প্রগতির কল্যাণে বৃহত্তর ভেনিসে হয়তো একদিন মোটর-গাড়িও চলবে। তবু অন্ধকারপ্রায় পুরানো প্রাসাদগুলির ছায়ায় ঢাকা জলের তৈলাক্ত চাকচিক্যের উপর দিয়ে যখন কোন গণ্ডোলায় রঙীন কাগজের বাতির আলোয় মৃদু গীতার ধ্বনির সঙ্গে O Sole Mio গান চঞ্চল জলরাশির কল্লোলের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে ভেসে যাবে তখনি বিচিত্র ভেনিসের পুরাতন ও প্রকৃত রূপটি ধরা পড়বে।

একটি দুর্লভ রাত্রি। বাতায়নের বাহির থেকেই পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ বুঝতে পারা যাচ্ছে আর গ্র্যাণ্ড ক্যানালের ঝিকিমিকি আলোর টুকরো সাইপ্রেশ-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। এমন মদির রাত্রে আমেরিকান টুরিস্টের মত "অগু রজনীর ফরাসী স্পেশ্যালি"টির ভোজনের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে না। উদ্যানপথে ঝাউকুঞ্জের পাশে পাশে প্রস্তরমূর্তিগুলি আহ্বান করছে। ওই পথেই আজ বাইরে যাওয়া উচিত।

ওই পথ কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না যদিও রোমের অহঙ্কার ল যে, সব পথ এসে রোমে মিশে যাবে। এ পথ সাঙ্গ হল ভেনিসের জলপথে।

সান মার্কোর চত্বরে আজ এ কী ব্যাকুলতা, মদির চঞ্চলতা! সারাদিন কেটে গেছে 'ডোজের' প্রাসাদে তিৎসিয়ানের ছবিগুলির সামনে; আজ রাত্রেও দেখি সেই তিৎসিয়ানের রং—সেই বর্ণমিশ্রণের সুষমা ইটালির আকাশে লিডোর সুনীল স্বচ্ছ জলরাশিতে। এমনকি, পৃথিবীর বৃহত্তম চিত্র তিন্তোরেত্তোর 'প্যারাডাইস'কেও তিৎসিয়ানের বলে ভুল হল বার বার।

ভেনিসের বাতাস আমার মনে ওলটপালট লাগিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক

পথচারী আমার চোখে কী নূতন আলোকে প্রতিভাত হচ্ছে। যে সার্থকতা এদের জীবনে নেই হয়তো, যে অস্তিত্বের কথা ভাবে নি এরা স্বপ্নেও, সেই গৌরবে এদের মহিমান্বিত মনে হচ্ছে। সাধারণ রিস্তোরান্তিতে অতি সাধারণ যে ভিক্ষুকশিল্পী ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে ভিক্ষা করছে, রিয়াল্‌টো সেতুর তলায় যে গণ্ডোলার মাঝি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত হয়ে কম্পমান ছোট তরীতে ত্রিভঙ্গিম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই যেন চিত্র থেকে নেমে এসেছে। অপরিচ্ছন্ন অপরিসর গলিপথের যে পথিক সেও আজ রাত্রিতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বুঝি বেরিয়েছে। চলতে চলতে ভুল করে কত পথের সহজ ভুলকেও ঠিক বলে মনে করে নিলাম। উদ্‌ভ্রান্ত মনের সুযোগ নিয়ে এক বৃদ্ধ তার হৃদয়বিদারক ও নিরাশাময় প্রেমের কাহিনীও শুনিয়ে দিল।

সে গল্পের নায়ক তো আমিও হতে পারতাম।

আরো অনেকেরই মনে একটু আঁচড় কাটতে পারলে হয়তো এমনই ব্যর্থ বেদনার কাহিনী বের হয়ে পড়বে। এই বৃদ্ধের মতই কতজন নীড় বাঁধবার সাধ ত্যাগ করে প্রিয়গৃহ ও প্রিয়াসান্নিধ্য থেকে দূরে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে, আমাজন নদের তীরের হরিৎ প্রান্তরে, অথবা আফ্রিকার দগ্ধ ঊষর অরণ্যানীর মধ্যে। তারপর, তারপর কত জনেরই যৌবন-স্বপ্নের করুণ অবসান হয়েছে। এই বৃদ্ধেরই মত বার্ধক্যে আবিষ্কার করেছে যে প্রেম কোন্ কৈশোরের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাতসারে মনের ধূসর মরুতে মিলিয়ে গিয়েছে। তখন হয়তো জীবনে আর কিছু সম্বল থাকে না, না কোন সন্তোষ, না কোন সান্ত্বনা। একথা ভাবতেও অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। Bridge of Sighs-এর তলায় জলরাশিও যেন নিশ্বাস ফেলল। সমগ্র মধুরজনী সে দীর্ঘশ্বাসে সাড়া দেবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হোক সে প্রবঞ্চনা। না হয় লোকে মনে করুক যে, অনভিজ্ঞের উপর বারুণীর প্রভাবেই নিশ্চয় এমন ভুল সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞ ও কাজের লোকেরা অনুকম্পার অমূল্য মৃদুহাস্য দিয়েই সে রাত্রিকে সম্মান দিল। বিদেশে যে পর্যটন করতে গিয়ে ব্রিডেকারের গ্রন্থের 'প্রাসাদের রাজপুত্রী' বা 'দুর্গম দুর্গের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ' প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী বিশ্বাস করে ও খুঁজে বেড়ায় এ সংসারে তাকে বোকাই বলে। এসব কথা ভদ্রোচিত অর্থাৎ 'রেস্‌পেক্টেবল' নয়।

না হোক। আমি সেই গল্পে এখনো বিশ্বাস করি। না করে উপায় কি? ভেনিসে যে মদির চাঁদনীরাতে রিয়াল্টোর তলায় সুনীল জলরাশি খেলা করে বেড়ায়। ভেনিসের স্মৃতি সব সময় মনে আসবে না। যে অস্পষ্ট আলোকে সান মার্কোর চূড়া শেষ দেখেছিলাম তাতেই সে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আর কোন বিমুগ্ধ নিশীথে চোখে স্বপ্নের পরশ ও হৃদয়ে সহানুভূতির করুণতা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসব না। কাজের ভিড়ে সে সব দিনের অস্ফুট গীতার ও ম্যাণ্ডোলিনের সুরের রেশ এমনি মিলিয়ে যাচ্ছে।

সম্ভবত ভেনিসের রাত্রিগুলি শুধু স্বপ্নই। কিন্তু সে রাত্রিটি তো স্বপ্ন নয়।

ইটালিয়া—জীবনসঙ্গীত

মিলান! মিলান নামটির সঙ্গে যেন ইটালির প্রাণের সঙ্গীত মেশানো আছে। ভিক্টর ইমানুয়েল গ্যালারির ছায়াময় বিশালতা যেন গানের রেশে পরিপূর্ণ। বিশাল তোরণ, তার বিস্তৃত সম্মুখভাগ ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গির্জাটাকে লুপ্ত করে দেবার স্পর্ধা রাখে। কাঁচ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ এখানে চোখে পড়ে না। সংস্কৃত যুগ হলে এর নাম দিতাম 'স্ফটিকতোরণ।'

ইটালির শহরগুলি বিশেষত্ব এই "গ্যালেরিয়া"। সব শহরেরই একটি সামাজিক কেন্দ্রস্থল আছে এবং তা হচ্ছে এই গ্যালারি, না হয় নগরোপকণ্ঠে কোন শৈলশিখরে প্রমোদোদ্যান। গ্যালারির চারদিকে সুশোভন দোকান-পাট, 'রিস্তোরান্তি' ও আরও কত কিছু। ভিক্টর ইমানুয়েল গ্যালারির একপাশে সাত হাজার প্রতিমূর্তিময় "পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য" ("la huitieme merveille du monde") এই মন্দির, অন্যপাশে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির স্মৃতিস্তম্ভ ও স্কালা থিয়েটার। গ্যালারির চারদিকের বিস্তৃত বাহুর মধ্যে চারটি জনস্রোত প্রবাহিত হয়, আর কেন্দ্রস্থলে আছে কাফে বিফ্‌ফি। মিলানের প্রাণ খুঁজতে গেলে তার মন্দিরে নয়, ঐশ্বর্যময় রাজবংশের কবরে নয়, এই কাফেতে আসতে হবে। সবাই সুবেশে সুরুচিপূর্ণ ভাবভঙ্গীতে রসালাপে ব্যস্ত; এধারে ওধারে পদধ্বনি বা কাউকে অভিনন্দন। উপরের কাঁচের skylight টি এই লোকদের কথার প্রতিধ্বনিতে গমগম করছে। এই পৃথিবীর গায়কদের শ্রেষ্ঠ পণ্যশালা; চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষার নন্দনকানন।

পৃথিবীর সব দেশ থেকে মন্দগায়ক-যশঃপ্রার্থীর দল এখানে আসছে। আগুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তারা পতঙ্গের মত। হত আকাঙ্ক্ষা বেচারীর দল'। তারা আজ মুখে প্রশান্তির ভাব দেখিয়ে সাধারণ 'ত্রাত্তোরিয়ায়, ম্যাক্‌রোনি খাচ্ছে। মনে আশা একদিন তাদের পদপ্রান্তে কুবেরের ঐশ্বর্য ও শিরচূড়ায় সরস্বতীর কিরীট এসে জড়ো হবে। কোন্ গায়ক এখানে আসেন নি? প্রথম চেষ্টায় মিলানের কাছাকাছি কোন শহরে একটু কাজ পেলে বা খবরের কাগজে একটু নাম উল্লেখ দেখতে পেলে বেঁচে যাবেন। প্রবীণের দল নিজেদের অতীত মূল্য ও বর্তমান মানের কথা শুনিয়ে নবীনদের মনে ভয়

এনে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত। অতীতের এরা জয়দূত। একদল সেরা অপেরাগায়ক তাদের কোনো হ্রদের তীরের প্রাসাদ ও কুঞ্জকাননের গল্প করছে। বর্তমানে তারা এই গানের জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদল তাদের নিজেদের দুর্ভাগ্যের নিন্দা করছে। তবু কত আশা।

সঙ্গীততীর্থের মধ্যে স্কালা হচ্ছে কাশী। মরজগতের মধ্যে অমরাবতী। এখানে পাদপ্রদীপ যার আনন উদ্ভাসিত করেছে তার ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল। কিন্তু এই আশামরীচিকা কত ভাগ্যকে অভিশপ্ত করে লুপ্ত হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। স্কালায় দেখলাম জাতীয় ললিতকলা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যে শিক্ষাগার আছে তাতে একদল কিশোরী প্রাণপণে শিক্ষানবিশি করছে। আবার মনে হল বেচারী এরা কত লীলায়িত গতিচ্ছন্দেই না ঘুরে বেড়াচ্ছে! এদের মধ্যে কতজনকেই হয়তো ঘোর নিরাশা ঢাকতে হবে হাসিমুখে। স্বর্ণকেশী ইংরেজ-বালিকা, তুষারশুভ্রাঙ্গী রুষীয়া, বহ্নিশিখাসমা হিস্পানী, হাস্যকৌতুকের লীলানির্ঝর প্যারিসানা, কত দেশ থেকে এরা এসেছে।

সহজ অথচ আত্মবিশ্বাসময় ভঙ্গীতে চলতে চলতে কলহাস্যে আলাপের মধ্যেও আশার আলোর স্বপ্ন মনের মধ্যে দেখতে হবে। বাইরে বেরিয়ে এসে কিন্তু এরা ভীতা চকিত হরিণীর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরা কি শুধু এ মন্দিরের বাহির দুয়ার পর্যন্তই পৌঁছবে? এতগুলি কিশোরী; কজনের ভাগ্যে রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল আলোক-দীপ্তি আছে?

স্কালা মিউজিয়মের অমর গীতনাট্য-রচয়িতা হ্যাদির স্মৃতি-বিজড়িত দ্রব্য-গুলির কথা আর মনে পড়ছে না। শুধু ভাবছি এদের মধ্যে কেউ হয়তো কিন্নর-কণ্ঠী মঞ্চসম্রাজ্ঞী জুদিত্তা পাস্তার মত মনোমোহিনী ও বিশ্ববিজয়িনী হবে। আর বাকী সব?

*   *   *   *

Niobe of Nations! রোম অবর্ণনীয়। প্রাচীন বিশাল রোম; অভিমানবের রোম।

শুধু রোমান নয়, রোমের সঙ্গে যে সংস্পর্শে এসেছে সেই অভিমানবের মত কিছু করে গেছে। তার চিহ্ন যেদিকে তাকাই সেদিকেই। রোম যদি শুধু ভ্যাটিকান প্রাসাদ ও সেন্ট্ পিটার্সেই শেষ হত তবু এই সেই রোমই থাকত; সব রাজপথই এদিকে নিয়ে আসত।

রূপ ভিন্ন মানুষের চলে না। আমরা যখন নিরাকার রূপহীনের কথা ভাবি তখনো অলক্ষ্যে হয়তো অজ্ঞাতেই তাঁরও একটি রূপ মনের মধ্যে মূর্তি ধরে ফুটে ওঠে। তরঙ্গের গতির মত, পুষ্পের সৌরভের মত, শিশিরসিক্ত তৃণদলের মুক্তালাবণ্যের মত গোপনে মনে তা একটি নিভৃত স্থান অধিকার করে। বৈজ্ঞানিক জগতে যার কোন রূপ নেই সেই আকাশেরও অসীম মোহন নীলিমা না থাকলে জীবনে আসত জড়তা, মনে থাকত না মুক্তি। সান্ধ্য গগনের তরল রক্তহৃদয় বেয়ে সীমা যেখানে অসীমের নিবিড় সঙ্গ চায়, আকাশ ও ধরণী যেখানে নিভৃত মিলনে আত্মহারা সেখানে আমরা কত রূপ ও কল্পনা সৃষ্টি করে নিয়েছি। সেজন্যই তো দিগ্বলয়রেখা এত সুন্দর, তার মধ্যে এত অমরজ্যোতির অনির্বাণ অঙ্কুরের সন্ধান পাই।

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।"

খ্রীষ্টমাসের দিনে রোমে খ্রীষ্টানের উপাসনা দেখে সেই কথাই মনে হল। পৌত্তলিক বলতে আমরা ঈশ্বরের রূপের পূজারী মনে করি। আমাদেরই মত এরাও রূপ আরাধনা কম করে না। খ্রীষ্টজীবন ও অন্যান্য সাধু-কাহিনীর কত বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যঞ্জনার প্রতিমূর্তি আছে সেণ্ট্‌ পিটার্সে। তার সামনে নতজানু হয়ে কত উপাসনা, পাপ-নিবেদন, ধূপসৌরভে দীপসৌষ্ঠবে কত প্রাত্যহিক পূজারতি। বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিনে পোপের প্রার্থনার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম Santa Maria Madre.

সেণ্ট্‌ পিটারের যে ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির একটি পদপ্রান্ত ভক্ত বিশ্বাসীদের চুম্বনে চুম্বনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে সেখানে এসে রোমের 'ক্যো ভাডিস' মন্দিরে যেখানে নীরোর অত্যাচারে পলায়মান সেণ্ট্‌ পিটারকে খ্রীষ্ট দর্শন দিয়েছিলেন সেখানকার প্রস্তরে তাঁর পদচিহ্নের কথা মনে পড়ল। হিন্দুর মতই রোমান ক্যাথলিকেরও ধর্মের মধ্যে কত কাব্য, কত কাহিনী, কত কল্পনার বিকাশ ও প্রকাশ। শুধু কি আমরাই রূপ সাধনা করি?

অপরূপ রূপ প্রাচীন রোমের। বিরাট মানব ছিল সেই জাতি যারা এই সব জয়স্তম্ভ ও জনমঞ্চ (ফোরাম) সৃষ্টি ও কল্পনা করেছে—যাদের বিজয়-অভিযানকে অভিনন্দন করার জন্য রাজপথ নির্মাণ করতে হত; যারা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লোকের স্থান দিত একটি কলিসিয়ামে। প্রাচীন

ধ্বংসস্তূপের সহস্র পাষাণশিলা অনিবার তার মৌন বাণী বিদেশী পর্যটকের অন্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে তোলে।

এইখানে কলিসিয়াম, এইখানে দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত কুমারী ভেস্তাদের মন্দির; এইখানে জুলিয়স সিজারের সমাধি ও ভগ্নস্তূপ। এখানে মানবাত্মার ত্রাস ও পরিত্রাণের কাহিনীর কী বিপুল অভিনয় হয়েছে পৌত্তলিক ও খ্রীষ্টান আদর্শের সংঘর্ষের সময়ে! ঐতিহাসিক হিসাবে এতদূর সত্য নয়, তবু কলিসিয়ামের হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ বা তার কাছে আত্মবিসর্জনের কথা 'কাটাকুমে' এসে না মনে হয়ে পারে না। কর্মকুশলতা যাদের ছিল বিশাল, নির্মমতাও তাদের অমানুষিক। তাই মৃত্যুর পরও খ্রীষ্টানের নিস্তার ছিল না, লুকিয়ে তাদের কবর দিতে হত এই তথাকথিত মন্দিরগুলির প্রাচীরগাত্রের গোপনতায়।

নিষ্ঠুরতা ও যন্ত্রণাকে রূপ দিতে পারার কৌশলে বোধ হয় ল্যাটিন জাতি অতুলনীয়। ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের অন্তরের অনুভূতি নয়, বাইরের বেদনাই যেন বড় কথা। মিলানের মন্দির সেন্ট্ বার্থোলোমিউকে জীবন্তে চর্মহীন করে হত্যা করার একটি বীভৎস ও বিখ্যাত মূর্তি আছে; আর এটিই সেখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। ভ্যাটিকানে সিস্টাইন চ্যাপেলে মাইকেল এঞ্জেলোর অতুলনীয় ফ্রেস্কোচিত্র "শেষ বিচার"; ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ লাওকুন, অ্যাপোলোর অনুপম সৌন্দর্য, এসব দেখে যত আনন্দ পাওয়া যায় তা সব ম্লান করে দিতে পারে এমনি ভীষণ একটি 'ট্যাপেস্‌ট্রি' চিত্র আছে; এক মাইলের আট ভাগ লম্বা এই বিরাট চিত্রে নিরীহদের হত্যা দেখানো হয়েছে। সেন্ট্ পিটার্সেও এমন কয়েকটি মোজায়েকের মূর্তি আছে যার নির্মাণ কৌশল অসাধারণ, কিন্তু যে-কোন বালককে বহুরাত্রির দুঃস্বপ্ন দিতে পারে।

কিন্তু বেদনাও যে কেমন করে পরম রমণীয় হয়ে উঠতে পারে তারও উদাহরণ পাই এখানকার একটি চিত্রে। বাণবিদ্ধ সিবাস্টিয়ানের আননে যে মাধুর্য ও দীপ্তি ফুটে উঠেছে তা ধরণীর ধূলাকে অতিক্রম করে স্বর্গের স্বপ্ন দেখতে প্রেরণা দেবে, আমাদের বিফলতার করুণ মুহূর্তগুলিকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করে তুলবে। প্যালাটাইন মিউজিয়মে মুমূর্ষু 'গলে'র যে মূর্তি আছে তা আমাদের মনে ভয় উদ্রেক করে না; করুণা জাগায়। বিফল বীরত্বের শেষ পরিচ্ছেদ যে মৃত্যু তারই অব্যক্ত কাহিনীর মর্মোদ্ঘাটন করে। দেহের প্রতিটি

রেখা কী দৃঢ়তাব্যঞ্জক; মুখের যন্ত্রণাচিহ্ন ও কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি কী জীবন্ত। কিন্তু এ মৃত্যুতে বীভৎসতা নেই। যে জীবনকে বীরত্বের সঙ্গে ধারণ করা হয়েছে তাকে সমান বীর্যের সঙ্গে ত্যাগ করার মধ্যে যে মহত্ব তাই আমরা এই মূর্তিতে পাই।

সভ্যতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার এমন সংমিশ্রণ আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিলাস কখনো বেদনার মর্মকথা বোঝে না। ভোগ ও লালসা দুঃখ ও লাঞ্ছনার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না। অতিমাত্রায় বিলাসী ও আত্মপরায়ণ পাট্রিশিয়ান তুচ্ছ সামান্য মূল্যের ক্রীতদাস বা চিরদাসের পরিশ্রমের ফলের উপর জীবনধারণ করত। কাজেই নিজের দুঃখের শিক্ষা তার হয় নি। দুঃখ কিন্তু জীবনে বড় কম সে পায় নি তাই বলে। বহিঃশত্রু আসে না বার বার রাজ্য জয় করতে। কিন্তু অভ্যন্তরের যে শত্রু সে হানা দেয় অহরহ।

এই রোমের অল্প ভূখণ্ডের মধ্যে যত পরোপজীবী ছিল তার তুলনা এখেন্সেও ছিল না। এখানে যত ধনরাশি, বিলাস ও পাপাচার হয়েছে তার তুলনা মেলে না। এই কুবের ও 'ব্যাকাসে'র রাজত্বে জীবন ছিল সংশয়ময়, মৃত্যু চরণ ফেলত গোপনে অতর্কিতে। লুকাল্লাসের পিনচো পাহাড়ে প্রমোদগৃহ ও কারাকাল্লার স্নান-হর্ম্য দুইই রোমান চরিত্রের বিশেষত্ব। কিন্তু নিষ্ঠুর ছিল এই বিলাস-নিকেতনগুলির আবহাওয়া। প্রমোদচঞ্চল চেলাঞ্চলের মৃদুবীজনে কত বসন্তসমীরণের কবোষ্ণ নিশ্বাস উড়ে যেত, আবার হয়তো ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান কোন অভাগা সম্রাট বা অভাগিনী রাজপ্রেয়সী গুপ্ত পথ দিয়ে সহসা মৃত্যুনদের তটে নিক্ষিপ্ত হতেন। এই প্রাচীন রোমের বাতাসে কত উদ্দাম কামনা, কত উন্মত্ত সম্ভোগের জ্বালাময় শিখা আলোড়িত হয়েছে, এখনো দুয়েকটি স্পর্শ হঠাৎ বায়ুভরে উড়ে এসে মনকে চঞ্চল করে দিয়ে যায়।

পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মতই রোম নিজের চিতাভস্ম থেকেই নিজেকে আবার নবজীবন দিয়েছে। অহল্যা পাষাণী পুনর্জন্ম পেয়েছে মুসোলিনীর স্পর্শে। রোম একদিনে নির্মাণ করা হয় নি, এবং আশ্চর্যের বিষয় পুরাতন রোম ও নূতন রোমে অস্তিত্বের জন্য কোন দ্বন্দ্ব নেই। অর্থাৎ যতই নূতন সৃষ্টি হোক না কেন, তা হচ্ছে শুধু প্রাচীর-প্রসার, প্রাচীন-সংহার নয়। সপ্তশৈলবেষ্টিত রোম সুদূরবিসর্পিত।

মুসোলিনী একজন প্রকৃত স্রষ্টা। রোমের বিশাল রাজপথ, যানবাহন-নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন উৎসধারা, প্রমোদকানন, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, ইটালির চোখের সামনে নূতন ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন, সবই তাঁর সৃষ্টি। ইটালির মত দেশ, রোমের মত নগরে নূতন শিল্পকলার যে আবর্তন হয়েছে তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হবে।

ফ্যাসিস্ট প্রদর্শনীগৃহে ফিউচারিস্ট আর্টের যে নিদর্শন পাই তা মনকে বিমুগ্ধ করবেই। অথচ প্রাচীনের গৌরব ও দর্শনীয়তা রক্ষা করেছেন তিনি সমান আগ্রহে। আগে এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে রোম দর্শন করা সম্ভব হত না। বিলুপ্ত সম্পদের শেষ ভগ্নপ্রায় স্মৃতিস্তম্ভগুলি তাঁরই চেষ্টার ফলে আরো বহুদিন দর্শকের উপভোগের বিষয় হয়ে রক্ষা পাবে। ইটালি যে যুদ্ধে নূতন জগৎ জয় করতে ছুটেছিল, মহাসমারোহে সাম্রাজ্যের রাজপথ (via del impero) নির্মাণ করেছিল, তার পিছনে বহু পরিমাণে আছে নবপ্রবুদ্ধ অতীতের গৌরবস্মৃতি।

পুরাতন রোমের ধ্বংসস্তূপের অপূর্ব চিত্রপট হচ্ছে নূতন রোমের ক্যাপিটল প্রাসাদ। নবীন গরিমা প্রাচীনের মহিমাকে অন্তরাল করে নি, তার অন্তরায় হয় নি, তাকে সুন্দরতর সম্পূর্ণতর করে তুলেছে। এমন আশ্চর্য সামঞ্জস্য অনুভব করতে হলে দেখতে হয়; দূর থেকে এমন বৈশিষ্ট্যময় বৈচিত্র্য কল্পনা করতে পারা যায় না।

এমনি সামঞ্জস্যময় চিত্রপট আছে নেপলসে। উপসাগরের পারে নেপলসের প্রশান্ত রূপ চিত্রার্পিতবৎ মনোহর, আরো পিছনে বিসুবিয়াসের অগ্নিউদ্গিরণ। সম্মুখের অদূর আকাশপটের বিচিত্র বর্ণ-গৌরবের উপর বিসুবিয়াসের ধূম্রমালা ধূসর আচ্ছাদন টেনে দেয়। তবু আকাশের বর্ণসমুদ্র বিলোপ করতে পারে না। শুধু মনে করিয়ে দেয়

"ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা"

দিনের চিতার এমন পরিপূর্ণ রূপ কোথাও দেখি নি।

বিসুবিয়াসের উদ্ধত রোষ ও প্রচ্ছন্ন হুঙ্কারের সামনেই যে জাতি এত উৎসবে উৎফুল্ল ও বিলাসে লীন হতে পেরেছিল সে জাতির মেরুদণ্ডের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। জীবনকে ভোগ করবার ও ত্যাগ করবার ক্ষমতা তাদের

ছিল অসাধারণ ভাবে। তাই অগ্নিগর্ভ গিরির পদতলে, তার ভ্রূভঙ্গির সম্মুখেই পম্পি (পম্পেই) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে যুগের ভস্মাচ্ছাদন তুলে ফেলে সেই শহরকে আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়েছে। আইসিসের মন্দির, রঙ্গনিকেতন (অ্যাম্ফিথিয়েটার), নাট্যভবন সবই দেখা যাবে। যে কুকুরটি যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ও যে রমণী সম্ভবত ললিত লাস্যে বহুজনেরই যৌবন-স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল তাদের দুজনেরই অস্থিকঙ্কাল অবিকৃত অবস্থায় দেখা যাবে। আর দেখা যাবে পৌরভবনগুলির চিত্রাঙ্কন-কৌশলের বহু সুন্দর উদাহরণ।

কী সৌভাগ্য, আমার সামনে আজ বিসুবিয়াসের পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয়েছে। বিপুল বজ্রনির্ঘোষ ও মুর্মুহু ভূমিকম্পের মধ্যে আমার ইটালিয়ান গাইড ক্রেটারে নিয়ে যেতে কিছুতেই আজ রাজী নয়। অথচ বাঙালী জীবনে এমন অ্যাডভেঞ্চারের মুহূর্ত দ্বিতীয়বার হয়তো আসবে না। ওই অগ্নিগর্ভের কত কাছে যাওয়া যায় তা আজ দেখতেই হবে উল্লেখের অযোগ্য শুধু প্রাত্যহিক দিনযাপনের বাইরে একটু না হয় সাহসী হবার চেষ্টাই করা যাক,

"ওরে, সাবধানী পথিক,
বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।"

গাইড হাত চেপে ধরে বারণ করল, কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে তার কথা কানেও ঢুকল না। মনের তো কথাই নেই। গন্ধকের গন্ধে যতক্ষণ শ্বাস রাখা যায় ও উত্তাপে পা রাখা যায় ততক্ষণ সামনে এগিয়ে গেলাম।

কিছুই আর দেখা গেল না, জীবনে এমন কোন বিষম বিপদ বা বিশাল কীর্তিও করা হল না। তবু দুটি রুমালে জড়ানো সেদিনের গলিত লাভাপ্রবাহের প্রস্তরীভূত পিণ্ডটির দিকে তাকিয়ে কখনো একা বসে ভাবব যে, হিসাব-এ সাবধানতাকুশল বাঙালী-জন্মেও একদিন সে সব উপেক্ষা করতে ছুটে গিয়েছিলাম।

* * * *

'রোমা' সুরম্যা। তাকে রমণীয় রাখবার জন্য সমস্ত ইটালিকে ব্যয়ভার বহন করতে হয়। আমরা বিদেশীরা সে খবর রাখি না বা রাখতে চাইও না। কিন্তু এমন সুন্দর প্রমোদকানন দিয়ে যদি চিত্রশালাকে সাজানো হয় তা হলে করভারও বোধহয় বহন করা যায়। বর্ঘিস প্রাসাদে ইতিহাসের "বর্তমান" অধ্যায়ের ইটালির গৌরবগুলি সাজানো আছে চমৎকারভাবে। ক্যানোভার

ভাস্কর্য-গৌরব পাওলিনার অর্ধশয়না মূর্তি চোখে স্বপ্নের আবেশ লাগিয়ে দিল ; পাওলিনা যখন এই মূর্তির জন্ম মডেল হয়ে "বসেছিলেন" তখন দাদা নেপোলিয় তাঁর প্রায়-বসনহীনতায় জন্ম শিউরে উঠেছিলেন। ভগিনী তার উত্তরে বললেন যে তোমার ভাবতে হবে না, ঘরে যথেষ্ট উত্তাপ আছে। ব্যবহারিক জগতের নয়, প্রতিভার উত্তাপের মাদকতা তার মূর্তির মধ্যে এখনো অনুভব করতে পারি।

ইটালির শিল্পীদের কথা আজন্ম শুনে ও জেনে এসেছি। ইয়োরোপ বলতে যত কিছু চিত্র মনে জেগে উঠেছে তার মধ্যে ইটালির এদের চিত্রই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আরো একটি এবার যোগ হল। ভাস্কর বার্নিনিকে নূতন করে জানলাম। তাঁর 'ডেভিড' মূর্তির সহজ সংহতি মনকে অভিভূত করল ; মনে মনে বললাম, বার্নিনি একান্তভাবে আমারই আবিষ্কার।

ক্যাপিটলাইন হিলের ধ্বংসস্তূপে বসে কত কি ভাবছি তার ইয়ত্তা নেই। ভাষায় যার আভাস দেওয়া যায় না, মুখ যার প্রকাশের বেলা মৌন হয়ে যায়, ইটালিয়ানের সেই জাতিগত বিশেষত্ব মধুর কিছু না করার (dolce far niente) ভাবে দেহ বিভোর, কিন্তু মন মুখর হয়ে উঠেছে। কি অতীতে, কি বর্তমানে বিলাস ও বীর্য এ জাতিতে সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সার দেশ জুড়ে সামরিকতার আড়ম্বর অথচ হ্রদগুলি কেমন পত্রপল্লবশোভায় মাধুরীমণ্ডিত স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে শান্তি বিতরণ করছে। রোমের মধ্যেই ক্যাপিটলের সম্মুখভাগে বিরাট ফ্যাসিস্ট শোভাযাত্রা হয়ে যাক না কেন, তবু পিছন দিকে কী সৌম্য শান্তি! সম্মুখের সঙ্গে পশ্চাতের যেন কোন সম্বন্ধই নেই, অথচ সামঞ্জস্যের অভাব দেখছি না। এই বৈচিত্র্যই বৈশিষ্ট্য।

এর একপ্রান্তে ভার্জিলের কবিতা, অন্যপ্রান্তে সিসিরোর বাগ্মিতা—একদিকে নীরো, অন্যদিকে মার্কাস অরেলিয়াস ; একধারে শৌর্য, অন্যধারে বিলাস। একযুগে সাধনা অন্যযুগে ভোগ। এই সব মিলিয়ে রোমের ভগ্নাবশেষ। ঐতিহাসিকের শিক্ষা, শিল্পীর চক্ষু ও ভাবুকের প্রেরণা না থাকলে রোমের অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা বৃথা। বর্ঘিস প্রাসাদে বার্নিনির একটি ভাস্কর্যের কথা মনে পড়ে। অ্যাপোলো প্রজার-পিনাকে অনুসরণ করেছেন তাকে ধরবার জন্যে ; কিন্তু যেই এক-একটি অঙ্গ স্পর্শ করছেন অমনি সেই অঙ্গ বৃক্ষলতায় পরিণত হয়ে সব স্পর্শকেই বিফল করে দিচ্ছে। সেই অপ্রাপণীয়া প্রজারপিনার মতই অবর্ণনীয়া রোমা।

সভ্যতা থেকে দূরে

সভ্যতা থেকে একটা পরিপূর্ণ দিনের নির্বাসন। মিডেলবুর্গের দুধমাখনের হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি সম্পূর্ণ অকারণে। বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। কিছু সুতী ও রেশমী কাপড়, পুঁতির মালা, রবার ও কাঁচের খেলনা, কুটীরশিল্পের কিছু সম্ভার, দুধ মাখন ডিম আর মাছ। গারো পাহাড়ের তলায় কোন হাটকে অনেকটা বড় অবস্থাপন্ন পরিচ্ছন্ন আর একটু রঙীন অর্থাৎ ইয়োরোপীয় করে দেখলেই বোঝা যাবে। দরদাম করা চলছে রীতিমত। চকোলেটের চালাঘরে ছেলেমেয়ের ভিড়। দুধমাখনের লোভনীয় গন্ধে আকৃষ্ট হয়েই কি এই ননীচোর রাখাল বালকবালিকারা এসেছে ভিড় করে?

তা নয়। আজ হচ্ছে এই ডাচ গ্রামটির উৎসবের দিন। এরা সকালবেলা গির্জায় গিয়েছিল, এখন এসেছে বাজারে। শুধু বেড়াতে আর মে মাসের রমণীয় রৌদ্রের উত্তাপ উপভোগ করতে। ছেলেমেয়েদের পরনে কালো পোশাক, সমস্ত মুখটি মধুর করে ঘেরা সাদা এক রকম টুপি মাথায়, হাতে সাজি, পায়ে কাঠের নৌকার মত জুতা। এই হচ্ছে এদের উৎসবের বেশ। আধুনিকতম সূক্ষ্ম বিরলবাসের আকর্ষণ নয়, প্রাচীন শোভন বিচিত্র সজ্জার আবেদনই এদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে আনন্দের দিনটিতে। সরল হাসিমাখা মুখে কোন অভাব-অভিযোগের ছাপ নেই। পরস্পরের হাতের ভিতর হাত মালার মত গেঁথে নিয়ে সাজি দুলিয়ে আনন্দের প্রভাতী আলো ছড়াতে ছড়াতে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে চলে যাচ্ছে। ওরা যেন প্রত্যেকেই বিধাতার নিজ হাতের তৈরী করা এক-একটি ফুল, এই মধুর প্রভাতের সব কিছু কমনীয়তার মধ্যে থেকে সব কিছুতেই পরিপূর্ণতা দান করছে।

নিজে আর ওই বয়সের অম্লান আনন্দের মধ্যে ফিরে যেতে পারব না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় বেলজিয়ামে আসবার ট্রেন ধরতে ইচ্ছা হল না কিছুতেই। একটা নামহীন অখ্যাত ওলন্দাজ ধীবরপল্লী আমায় আকর্ষণ করল। সমুদ্রের নোনা গন্ধ আর মাছের মেশানো গন্ধ আর কখনো হয়তো এমন সহজভাবে

নিতে ইচ্ছা হবে না। কিন্তু সেই আঁধার বিজলীবিহীন রাতের বিজাতীয় বন্ধুদের সাহচর্যে সবই ভাল লাগল। পা ছড়িয়ে বসে তাদের সরল অথচ কঠিন জীবন-যাত্রার কাহিনী শোনা গেল। ট্রলার কেন, বড় নৌকাতেই তারা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনতে পারে। দল বেঁধে তারা বের হবে নৈশ অভিযানের রত্নাকরের কাছ থেকে শুধু মৎস্য আহরণের জন্য। কী সরল উদার মন এদের, যদিও এরা এই সমুদ্রের ওপারে কি আছে তা না জেনে নিজেদের তটভূমিটুকুর সংকীর্ণতাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আছে। জলপথে এদের বিজয়-অভিযান অবারিত। কখনো কখনো প্রতিকূল আবহাওয়ায় বহু দূরে বা বিপথে চলে গেলে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাদের ফিরে আসার পথ চেয়ে তীরে অপেক্ষা করবে। বৃদ্ধরা শোনাবে তাদের নিজেদের অতীত বিপদ ও বীরত্বের কাহিনী, আর মায়েরা শিশুদের ছেলেভুলানো ছড়া শোনাবে—স্বামীদের কীর্তিকাহিনী তৈরী করে। যেদিন ঝড় খুব বেশী হয় সেদিন অভ্যস্ত হলেও তীরে দাঁড়িয়ে কত শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত বক্ষের দুরুদুরু কম্পন।

আমি তাদের বাংলার পল্লীবধূদের জলে প্রদীপ ভাসিয়ে সৌভাগ্য গণনার কথা বললাম। তারা মুগ্ধ হয়ে শুনল, আর আরো অনেক কথা জানতে উৎসুক হল। কিন্তু আজ তো আমি নিজেদের কথা শোনাতে আসি নি; এসেছি এদের কথা শুনতে, এক রাত্রির জন্য শিক্ষা ও সভ্যতার স্থূলভ অভিমান ভুলতে, জীবনকে সহজ সরল করে অনুভব করতে।

পৃথিবীর এই ভূমিখণ্ডের মাত্র ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে সমুদ্রের পশ্চিম পারের আধুনিকতা থেকে পরিপূর্ণ বিরাম পেলাম। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের প্রায় সর্বত্রই বিংশ শতাব্দীর বণিক্-সভ্যতার কথা ভুলে মধ্যযুগের আবহাওয়ায় প্রাচীন অথচ আধুনিক শহরগুলিতে ঘুরে বেড়াতে পারি। ঘেন্ট শহর ইয়োরোপের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। তবু সে কথা চিহ্নহীনভাবে ভুলে নিশ্চিন্ত মনে মধ্যযুগের শিখরকণ্টকিত দুর্গগুলির মধ্যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি রাজপথেই সাতশত গজের মধ্যে সাতটি এমন দ্রষ্টব্য স্মৃতিস্তম্ভ আছে যা মনকে ইতিহাসের পাতার ভিতর দিয়ে কত পিছনে নিয়ে যায়। মনে পড়ে ক্রুসেডের কথা। এমনি একটি ক্রুসেড-যোদ্ধা কাউণ্টের দুর্গের ভিতর বা জেরার্ড নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক দস্যুর হৃৎকম্প সৃষ্টি করবার মত ভীষণ প্রাসাদের ভিতর এলে আর মনে হবে না যে ঠিক বাইরেই ব্যস্ত জনাকীর্ণ খুঁজি-

ধূলিকিত রাজপথটি শেয়ার বাজারের চঞ্চল দামের ওঠানামার কথায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

আরো একটু দূরে দুটি সন্ন্যাসিনীদের মঠ। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই দুটি উচ্চ প্রাচীর দিয়ে বাকি শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান যুগের বিশাল শহরের মধ্যেই মধ্যযুগের একটা ছোট শহররূপে মধ্যমণির মত বিরাজ করছে। তাদের পথগুলি সংকীর্ণ, এঁকেবেঁকে গেছে। বাড়িগুলি বিচিত্র, আর প্রাচীন পন্থী পোশাক নম্র শত শত সন্ন্যাসিনী দীনভাবে দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থনার মধ্যে। তাঁদের একজন তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন ও একটি প্রার্থনা করে আমার উপস্থিতি পবিত্র করে দিলেন। সেই আসবাববিহীন সামান্য উপকরণের ঘরটির অধিবাসিনী এ জগতের নয়, তাঁর আবাস ও বহির্বাস, জীবিকা ও জীবন পৃথিবী থেকে সরিয়ে এনেছেন। এমনকি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের অপরিহার্য ধূলির প্রাচুর্যও এখানে প্রবেশ করে না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট বার্ভোর গির্জায় অজ্ঞাতসারে আবিষ্কার করলাম ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভ্যান ডাইক ভ্রাতৃদ্বয়ের "রহস্যময় মেষের সংবর্ধনা।" আর-একটি মজার জিনিস জানা গেল। জন অফ গণ্টের জন্ম হয়েছিল এখানেই, যদিও শেক্সপীয়রই তাকে প্রকৃতপক্ষে জন্ম দিয়েছেন আমাদের কাছে।

তাই বলে আধুনিকতারও অভাব নেই বেলজিয়ামে। ব্রুসেল্স তো একট ছোটখাট প্যারিস। ওই একই রকম আমোদপ্রমোদ, রাজপ্রাসাদ, বুলভার, কাফে, মায় ভাষা পর্যন্ত, সভ্যতার বিকাশের দিক দিয়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে যে তারতম্য তা এ দুটি দেশের রাজধানীতেও পাওয়া যাবে। ঐতিহাসিক বিবর্তন, চারুশিল্পের প্রচার, শৌখীন জিনিসের ব্যবসা সবই প্যারিসের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, অনুকরণ নয়, বলে মনে হয়। অনুকরণ শুধু মনে হয় শহরটির গঠনপ্রণালী, আধুনিক শিল্পরুচি ও অধিবাসীদের নাগরিকতায়। যদিও এদেশে ফ্লেমিশ ও ফরাসী দুই ভাষাই চলে, রাজধানী সভ্যতার ভাষাটিকেই পরিপাটিভাবে গ্রহণ করেছে।

কেবল একটি বিশেষত্ব একে বেলজিয়াম জাতীয়তার অভ্রান্ত অসংশয়-চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। নেদারল্যাণ্ডসে দুটি জিনিস জাতীয়তা-গঠনে মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল, একটি হচ্ছে গিল্ড হাউস অর্থাৎ বণিক্-সভাগৃহ ও অপরটি টাউনহল অর্থাৎ

পৌরগৃহ। প্রথমটি বাণিজ্যের ও দ্বিতীয়টি রাজ্যপরিচালনার প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতি বেলজ শহরে এ দুটি থাকবেই। এদের গৃহশিল্পের ধারা এই সৌধগুলির মধ্যেই উন্নতি লাভ করেছে। ঘেন্টের স্কিপার্স হাউস এদেশের গথিক শিল্পের সবচেয়ে সুন্দর বণিক-সভাগৃহ। প্রত্যেক পৌরগৃহের সঙ্গে ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত। ব্রুসেলসের গৃহটিতে ও সামনের "গ্রাঁদ প্ল্যাসে" এদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম ভাগের ও স্পেনের সঙ্গে সংঘর্ষের কয়েকটি করুণ কাহিনীর স্মৃতি আছে।

বেলজিয়ানরা প্রধানত ধর্মপ্রাণ। এদের স্বাধীনতা যুদ্ধও আরম্ভ হয়েছিল অনেকটা ধর্মকে উপলক্ষ্য করেই। কিন্তু এত নীরবে ধর্ম তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে যে চমৎকৃত না হয়ে পারি না। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর, কিন্তু মন কৃত্রিম হয়ে যায় নি। আর মধ্যযুগের আবহাওয়া নষ্ট না হয়ে যাওয়ায় ধর্ম ও আধুনিকতাকে পরস্পরবিরোধী মনে হয় না এদের জীবনে। এদেশের ধর্মের কেন্দ্রস্থল 'মালিনে'তে এই কথাই মনে হল। নীরব ধর্মচর্চার ফলে ধর্মপ্রাণতা এত ব্যাপক, তবু রাষ্ট্র ও ধর্মে কোন সংঘর্ষ হয় নি।

"হোলি ব্লডে"র শোভাযাত্রা বোধ হয়। ইয়োরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মের শোভাযাত্রা। সব জায়গা থেকে ২রা মের পরের প্রথম সোমবার ক্যাথলিকরা তীর্থ করতে আসে ও "আমাদের অশ্বারোহী প্রভু"র রক্তের স্মারককে সম্মান দেখিয়ে যায়। শোভাযাত্রার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বাইবেলের কাহিনী-গুলি বর্ণনা ও অভিনয় করা হয়। পুরাতন টেস্টামেণ্ট থেকে নেওয়া হয় খ্রীষ্টের যন্ত্রণার ও নূতন টেস্টামেণ্ট থেকে তাঁর জীবনের কাহিনী। তারপর হয় ফ্লাণ্ডার্সের কাউণ্টের সমারোহে প্রবেশ এবং তারপর বিশপদের পিছনে পিছনে ও নাগরিক পিতাদের ও "মহাশোণিতের ধর্ম ভ্রাতা"দের সামনে স্বর্ণপাত্রে সেই পবিত্র রক্তের চিহ্নের প্রবেশ। দুই ঘণ্টা লাগে এই শোভাযাত্রার অতিক্রম করতে। চারদিক থেকে ঘণ্টাধ্বনি হয় ও বিশপ রক্তচিহ্ন দেখাবার জন্য নতজানু জনতাকে আশীর্বাদ করেন।

আবার সেই ক্রুসেডের কথা এসে পড়ে। দ্বিতীয় ক্রুসেডে বিশেষ বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফ্লাণ্ডার্সের কাউণ্ট এই রক্তের স্মারকটি জেরুসালেমে উপহার পেয়েছিলেন। তিনি সেটি ব্রুজ শহরকে দান করেন ও ম্যাজিস্ট্রেটসজ্ঘ সেটি এ পর্যন্ত শ্রদ্ধাভরে সাধারণের জন্যই রক্ষা করে আসছেন। এদেশে না ছিল ধর্মান্ধতা, না ধর্মের নামে ব্যবসায়পরায়ণতা।

উত্তর দেশের এই ভেনিসকে মধ্যযুগের স্রোত ভেনিসের খালের মতই ঘিরে রেখেছে। যদিও এই ব্রুজে আজ অনেক পরিবর্তন হচ্ছে, তার খালের জলপথে ঘেরা প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি দেখবার জন্য আধুনিকদের আগমন হয়। সেগুলি দেখাবার জন্য আধুনিক উপায়ে চেষ্টা করা হচ্ছে, তবু ব্রুজ এখনো মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছায় নি।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতীক বলতে হবে গত মহাযুদ্ধকে। তার অগ্নিশিখা একেও স্পর্শ করেছিল ; এখান থেকে বাসে করেই ইপর্ (ব্রিটিশ 'টমি'র বিখ্যাত 'ওয়াইপারস') ডিক্সমুড, নিউপোর্ট প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে আসা যায়। মরণলীলার সেই মহাশ্মশানগুলিতে 'ট্রেঞ্চ'গুলি এমনভাবে এখনো সাজানো আছে যে, সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গপথে মাটির নীচে নামমাত্র আশ্রয়স্থলে বা চোরা কুঠরীতে ঘুরতে ঘুরতে গা ছমছম করে ওঠে ; ভয় হয় যে, এখনি কোন সঙ্গীনধারী শত্রুসৈনিক বিরাট গালপাট্টায় অট্টহাসি জাগিয়ে আমারি অবস্থা সঙ্গীন করে তুলবে। এত কাছে এই যুদ্ধক্ষেত্রগুলি।

তবু ব্রুজের প্রাণকে তারা স্পর্শ করতে পারে নি। বর্তমানের চঞ্চল উদ্দাম জীবনযাত্রার ঢেউ ব্রুজের খালগুলিতে এসে পৌঁছায় নি। এ যুগের যন্ত্রশিল্প এখানে নেই, নেই বিশাল মসৃণ ম্যাকাডামের রাজপথ। সংকীর্ণ গলিপথের দুধারে অচ্ছ প্রাচীন গৃহদ্বারে প্রাচীনারা লেসের কাজ করে যায়—তাদের সামনের প্রস্তরবন্ধুর পথে বিদেশী উৎসুক আধুনিকদের একেবারে উপেক্ষা করে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত belfryএর চূড়ার carillonএর কাঠের ডাণ্ডায় হার্মোনিয়ামের রীডের মত ঠুকে ঠুকে ঘণ্টা বাজিয়ে নানা বিদেশী সুরের ঐকতান বাদনের মধ্যে ব্রুজ সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। আর রাত্রির 'বল' নৃত্যের চটুল চরণাঘাতে তার নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

পশ্চিমে সমুদ্রতীরে অস্টেণ্ডের নৃত্য ও জুয়ার তীর্থ কুর্সাআলের সামনের বাসবিরল সমুদ্রস্নানের বালুবেলাতেও ব্রুজে শোনা সেই সুরের ধুয়াটি কানে বাজছে—

'Somewhere a voice is calling.

স্বর্গ হইতে বিদায়

"ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা।" আমার কৈশোর কল্পনায় স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার সময় এল। নিশান্তের সুখস্বপ্ন সম তিনটি বৎসর। খুব বেশি দিন নয়। অথচ যেন একটি জন্মান্তরের ওপার থেকে পূর্ব দিগন্তের অরুণোদয়ের দিকে প্রথম তাকাচ্ছি। আর অন্তরের মধ্যে রয়েছে একটা করুণ নিস্তব্ধতা। তাই এখন নিজের মনের হিসাব খতিয়ে দেখবার সময় এল।

মনে পড়ছে, কমলা-সৌরভমদির ভ্যালেন্সিয়ার বালুবেলায় বসে পূর্ণিমা রাত্রিতে পূর্বমুখ হয়ে দেশকে উৎসর্গ করে নীল ভূমধ্যসাগরে একটি ফুল ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, স্বপ্নে একবার আকুলভাবে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছিলাম পদব্রজেই, আর একটি পদক্ষেপের সঙ্গে একটি করে পদ্মফুল জলের মধ্যে জেগে উঠেছিল। সে স্বপ্ন দেশের মাটিতে পাদস্পর্শের সঙ্গেই ভেঙে গিয়েছিল। এখন দেশে ফিরবার সময় সে আকুলতার সঙ্গে উদ্বেগ মিশে যাচ্ছে। এতদিনে না জানি কত বদলিয়ে গিয়েছি। অথচ দেশ যদি অভিমানভরে তা না বুঝতে চায়?

কিন্তু আমাকে বদলাতে যে হবেই। ইয়োরোপের বিচিত্র বহুমুখী প্রাণের সংস্পর্শে এসেও যদি কেউ না বদলায় তাকে জড়পদার্থ বলতে হবে। ইয়োরোপে কেন, শুধু ভারতবর্ষেই যদি থাকতাম তবু নব নব ভাবসংঘাতে পড়ে কত বদলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই। অথচ প্রত্যহের দেখা সেই পরিবর্তন কারো চোখে ঠেকত না। কোন ভাবধারাই এই পরস্পরের সংযোগময় যুগে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর সেই ভাবের আবর্তের মধ্য থেকে বহুদিন পরে যখন হঠাৎ উঠে আসব তখন সবাই সবিস্ময়ে তাকাবে। যদি কেউ বলে—"আহা! কি সুদৃষ্টান্ত দেশে ফিরে এল বিদেশ থেকে; একটুও বদলায় নি।" তা হলে সেটা মর্মান্তিক হবে। এই ধরনের কথা হবে প্রকারান্তরে গতিশীল মনের অপমান। যা আমার হয়েছে তা তো পরিবর্তন নয়, তা পরিণতি। জীবন ধরেই যেন এই পরিণতির ক্রমবিকাশ হতে থাকে।

দেশে ফিরে আসব, কিন্তু শকুন্তলার তপোবনবাস ত্যাগকালের মত

বিচ্ছেদবিধুর পিছুটান কি পদে পদে অনুভব করব না? মনে পড়বে না আমার এই ক্ষণিকের কুটীরটিকে? তার বাতায়নটিকে, যার ভিতর দিয়ে বিরাট লণ্ডনের দূর কোলাহল তরীর তলে ছলছল শব্দের মত অস্পষ্টভাবে ভেসে আসত? যার নীচের পথচারী-পথচারিণীদের উল্লাসময় শোভাযাত্রা দেখে কল্পনায় তাদের জীবনকে কাব্য মনে করতাম? যার ভিতর দিয়ে আসন্ন শীতের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর দিনগুলি আমার কক্ষকোণে আলোকের সুদীর্ঘ স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে? যার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি এ চিন্তাহীন প্রবাসের কত নব পরিচয়সুখ নব নব বিস্ময়ের দান দিগন্তের বর্ণম্লানিমায় শরতের শেষ রশ্মিরেখার মত করুণ অবসান লাভ করে যাবে? মনে কি পড়বে না সে দিনগুলির কথা, যখন আশায় সফলতায় কর্মভারে সার্থক দিনগুলির শেষে অগ্নি-উদ্ভাসিত আমার ঘরটিতে শুভ্র লাইলাক-গুচ্ছের তলে মুখ রেখে বসে নীরবে আত্ম-উপলব্ধি করতাম?

কিন্তু ইয়োরোপের মনে শান্তি নেই। তার সমৃদ্ধি আছে, সংহতি নেই। শক্তি আছে, শান্তি নেই। অহরহ পরিবর্তন, নিত্য নূতনের অভিষেক। সেই গানটার কথা মনে পড়ে, Paris, stay the same। কিন্তু পারী কী সেই থাকবার পাত্রী? ইয়োরোপ তো ধ্যানমগ্ন আত্মসমাহিত অপরিবর্তনীয় ভারতবর্ষ নয়, তাকে পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলতেই হবে। নব নব বিকাশের পথে তার গতি। তার ভবিষ্যৎ পরিণতি তো বর্তমানেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

যে অফুরন্ত জীবনোৎসব দেখেছি শুধু তা-ই ইয়োরোপের শেষ কথা নয়। তার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে মরণোৎসবের বীজ। নটরাজের এই চিন্তাহীন উদ্দেশ্যহীন অকারণ পুলকে নৃত্যের মধ্যে শুধু জীবনের নয়, মরণের ছন্দও বাজে। প্রতি মহাযুদ্ধের সময় সে ছন্দ জেগে ওঠে; আবার যে-কোন সময় তা জাগতে পারে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি ও সংহার দুইয়েরই লীলা ইয়োরোপে হচ্ছে প্রচুর। আমাদের দেশের উপর বুঝি পড়েছে স্থিতির ভার। তাই সে শতাব্দীর পর শতাব্দী আত্মসমাহিত হয়ে একই ভাবে রয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের চির-চঞ্চলতা থেকে অনেক দূরে। তবুও সে চঞ্চলতা ও পরিবর্তনের ঢেউ প্রাচীকে কম আঘাত করছে না।

একটি বিশেষণে একটি মহাদেশের সম্যক্ পরিচয় হওয়া অসম্ভব, বহিরন্তর

হত তা. হলে 'ইয়োরোপকে বলতাম চিরনবীন। তার মানে এ নয় যে, সে চিরকাল একই নবীনতার মধ্যে রয়েছে; যুগের পর যুগে তার বিভিন্ন রূপ; কোন রূপ পুরাতন হবার আগেই কালস্রোত তাকে ভাসিয়ে নূতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ইয়োরোপকে আমার চেনা শেষ হল না। অনন্ত জীবনোৎসব ও আসন্ন মরণ-সমারোহের মাঝখানে যে প্রাণের বৈচিত্র্য তার কত চিত্রই এখনো বাকি রয়ে গেল। কিন্তু সবই কি শেষ করে দেখা যায়? নিজের মনকেই কি শেষ করে জেনেছি? সিন্ধুগামী তরঙ্গের মত জীবনস্রোত কত দেশের তট অনুভব করে, কত উপলবিষম বা সহানুভূতি-শ্যামল পথে ঘুরে ঘুরে চলবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। আবার যদি আমার কৈশোর-স্বপ্নের তীর্থে আসি, কত জিনিস নূতন আবিষ্কার করব তার সীমা নেই। ইয়োরোপ এগিয়ে যাবে, আমার মনও যাবে এগিয়ে, কারণ এ দুইয়ের কেউই স্থাণু নয়। তাই আবার নিত্য নবীনের সঙ্গে হবে নব পরিচয়। এ তো শতদল পদ্ম নয়। এ যে নিত্যপ্রসারী প্রাণপুষ্প। তার প্রত্যেকটি দলের রূপ রস ও পরিচয় স্বতন্ত্র। সে বৈচিত্র্যের আশায় দিন গোনা—সেও তো কম কথা নয়।

তবু—তবু যতই মোহিনী হোক ইয়োরোপা, সে আমার নয়। আমার নিয়তি এখানে নেই, আছে আমার দেশে। এখানে যা পেলাম তা মনকে করেছে উর্বর। তবু মনের উদ্ভব তো এখানে হয় নি। কাজেই যা পেলাম তা যদিও কম নয়, তা-ই সব নয়। আমার জীবনের পরিণতি এখানে হতে পারে না। এখানে কেউ আমার জন্য প্রার্থনা করবে না, সৌভাগ্যকামনা করে তুলসী-তলায় সন্ধ্যাদীপ দেবে না। রবীন্দ্রনাথের শাপভ্রষ্টের 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' সময়ের মতই অশ্রুবাষ্পহীন হবে আমার প্রত্যাগমন। আর এপারে আমার দেশও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে হয়তো অনেক দিক দিয়ে। সে যেমন আমায় পরীক্ষা করে নেবে তাকেও আমি নূতন আলোকে দেখতে পাব। যার মধ্যে জন্ম ও প্রথম জীবন যাপন করেছি তার মধ্যেই যে সব রূপ, সব সত্য ও সব আশা নিহিত নেই, এই জ্ঞানের আলোকে দেশকে দেখতে পাব। আর আমাদের মৃত্তিকার অনাদৃতা মাতার মমতা ও স্নিগ্ধ হাসির মায়া ওপারের তীব্র আলোক-দীপ্তিকে ধীরে ঢেকে দেবে, তার অভাবকে সহনীয় ও ক্রমে সহজ করে তুলবে। আমার হবে রূপান্তর।

তবু ইয়োরোপের বিচ্ছেদব্যথা পদে পদে অনুভব করব। বিশেষ করে যখন

গ্রামে ও গ্রাম্যশহরে দিনের পর দিন বৈচিত্র্যহীন জীবন-সরসীর শ্যামল শৈবালদলে জড়িয়ে যাব, এই আলোকোজ্জ্বল লীলাময় জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজের সত্তা ভুলে যাবার বিপুল বিরতি পাব না। পাব না আনন্দচঞ্চলতা ও অপরিসীম উৎসাহ, পাব না নিজেকে ভুলে নিজেকে বিশ্রাম দিতে। এমনই পথে ভিড় থাকবে, থাকবে মনে অনাড়ম্বর ভীরুতা, শুধু থাকবে না পরিচয়হীন ভেসে যাওয়ার সুখ। এমনই আমি থাকব, থাকবে আমার অনুভূতি-প্রবণ মন, শুধু পারিপার্শ্বিক যাবে পরিবর্তিত হয়ে। আমার আমি হয়তো আড়ষ্ট হয়ে আসবে সংসারের প্রয়োজনে, কৃত্রিমতা ও সহানুভূতিহীনতার মলিন আবেষ্টনে।

কিন্তু সত্যিই কি তা-ই হবে? জীবনের শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রভাবান্বিত বৎসর ইয়োরোপে কাটালাম। তার তুলনা আর হবে কিনা জানি না। আর সব ফিরে পেতে পারি কিন্তু সে সময়কে ফিরে পাব না যে সময়টুকুতে অসীমের শেষ সীমাভরা অমরাবতী এই ধরাতেই রচনা করলাম। নিজের ব্যক্তিত্ববিকাশের যে সময়টুকু সকল প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে আমার কল্পনায় জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভদৃষ্টির মত হয়ে রইল। তার আনন্দ-আভাস প্রত্যহের দিনযাপনের গ্লানি ছাপিয়ে প্রভাতদীপ্তির মত জেগে থাকবে। মানি, যে দেশের নিকষে বিদেশের অনেক সোনা হয়তো শুধু সোনালী বলেই প্রমাণিত হবে, তবু ইয়োরোপা হাতে যে মাধবীকঙ্কণ, চোখে যে রূপকজ্জল পরিয়ে দিয়েছে তা চিরদিনই অম্লান থাকবে।

আমার পূর্বাচল পশ্চিমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে রইল।

চিরকালের ইয়োরোপা

শকুন্তলা যদি রাজপুরীতে প্রায় দু যুগ কাটানোর পর তপোবনে ফিরে আসতেন কণ্বমুনির আশ্রম তাঁর কেমন লাগত ?

খুব গভীরভাবে অথচ হাসিমুখে আমায় এই পালটা প্রশ্ন করলেন একটি ইংরেজ বন্ধু। বিশেষ কোঠায় আমরা এক সঙ্গে মিডল টেম্পলে আইনচর্চা করেছি, নৌকা বেয়ে যাওয়াতে পাল্লা দিয়েছি, আলোচনা করেছি নানা ভাষার সাহিত্য আর নানা দেশের শিল্পকলা।

তাঁকেই প্রশ্ন করেছিলাম,—এই দু যুগ পরে আজ আমার ইয়োরোপকে কেমন লাগার কথা ?

কিন্তু এ হেন পালটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বন্ধুই আমায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে শকুন্তলার তপোবনবাস ত্যাগকালের মত বিচ্ছেদ বিহ্বল পিছুটান সেদিন আমি অনুভব করেছিলাম। আজ উত্তর চল্লিশে সেদিনের অনাগত চব্বিশের মনের রঙ আর দৃষ্টিকোণ কতখানি বদলিয়ে গিয়েছে তারই উপর নির্ভর করছে আমার প্রশ্নের উত্তর আর তাঁরো প্রতি-প্রশ্নের উত্তর।

আর ইয়োরোপা ? সে-ও কি তার চির-তারুণ্যের কল্যাণে পরে আছে সেই একই বেশভূষা ? সাজায় নি কি তার বনে-উপবনে নব তরুবীথিকার কুঞ্জ ? দেয় নি মুখে নূতন কোন প্রসাধনের প্রলেপ ? মনে কোন মিশ্র রাগ অনুরাগের অঞ্জন ?

এত বছর ধরে কর্মব্যস্ত সংসারের সীমানার বাইরে আবার পা বাড়ালাম। থাকুক পিছনে পড়ে রাজধানী লণ্ডন আর যে ফেয়ার তাদের সরকারী আবরণ আর দরবারী পরিচয় নিয়ে। আমার আমি তার সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে মানস আকাশে মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে পাখা মেলল।

আকাশে ঘুরতে ঘুরতে নেমে এলাম এয়ারপোর্টে। কই, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জেনিভা থেকে লণ্ডন পর্যন্ত সমস্ত ইয়োরোপের উপর বাদল অন্ধকার ও কুয়াশার মায়া ছড়ানো রয়েছে। টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরছে আর

কনকন করে বইছে হিমেল হাওয়া। বেতারে নির্দেশ শুনতে শুনতে এরোপ্লেন কোন রকমে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে নেমে এল।

এই ভাল, এই ভাল। আমিও আঁধারে পথ খুঁজে খুঁজে অঝোর ধারা মাথায় নিয়ে আবার ইয়োরোপকে আবিষ্কার করব।

আজ কিছুতে যায় না মনের ভার
শ্রাবণ মেঘে গগন অন্ধকার।

সে আমাদের মনোভাবের ভার! ইয়োরোপের নয়। তাই বৃষ্টি মাথায় করে বর্ষাতি পরে অগণিত নরনারী ছুটে চলেছে। মুখে তাদের হাসি, বুকে আশা। অনেকে চলেছে সিনেমায়, নাচঘরে। কেউ বা দীর্ঘ দিনের শেষে ফিরছে আপন কুলায়ে। কিন্তু প্রত্যেকেরই চলনে আছে গতি, আছে ছন্দ। দিনগত পাপক্ষয়ের পর ড্যালহাউসি স্কোয়ারের চারপাশে জীবনের যে অপচয় দেখি তার ছাপ নেই কোথাও। দু-ধারে দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, তবু সারা পথ আলোয় আলোময়। আমিও মনের মধ্যে তার উজ্জ্বলতা অনুভব করলাম। নিজেরই অজ্ঞাতে গায়ের উপর থেকে ওভারকোট সরিয়ে নিলাম। কাজের শেষে ওদের দেহে মনে যে আসে নি ঔদাস্য অবসাদ; দিনের অস্ত আনে নি প্রাণধারার অবসান।

ভোরে, অতি ভোরে উঠে পরদা সরিয়ে জানলা খুলে বাইরে তাকালাম। রাস্তার ঠিক ওপারেই সামনের বাড়ির জানালার কার্নিসে থরে থরে সাজানো রয়েছে টিউলিপ। কাগজের নয়, ঝরে-পড়া নয়, নতুন ঋতুর প্রথম অবদান। পাশেই বোমায় ধ্বংস একটা বিরাট বাড়ি আবার তৈরী করা হচ্ছে। টিউলিপ ফুলের হাসি মনে করিয়ে দিল যে বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। এই এত বড় বিশ্বনাশী যুদ্ধে ইয়োরোপে মহামারী বোমাক ধ্বংসকাণ্ড হয়ে গেল। এই এক মাস আগে এমন শীত এল যা স্মরণকালের মধ্যে নাকি আসে নি। তবু ইয়োরোপের জীবন তাতে ব্যাহত হয় নি, মন হয় নি জরাগ্রস্ত।

জেনিভা থেকে রওনা হয়ে এরোপ্লেন যখন হ্রদের চার পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পাকে পাকে আকাশে উঠতে লাগল তখন দেখেছি ওই দুরন্ত বরফের শীতে লোকে খেলছে শীত ঋতুর খেলা, যৌবনের লীলা। শহরের সবচেয়ে বেশী অভিজাত পল্লীতে সরোবর জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল; তার উপরে সবাই এসে

স্কেটিং করল, নাচল, বিজলী বাতি জালিয়ে। কাঁথা কম্বল বালাপোশের ভার মনের উপর চাপিয়ে নয়।

কিন্তু শুধু মনের উত্তাপে জীবনকে ভরিয়ে রাখা যায় না। তাকে দিতে হবে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য, চির-অগ্রগামী সভ্যতার নবতম উপকরণ। তাই বাড়িতে উত্তাপ বাড়াবার, বেশী গরম কাপড় তৈরী করবার নানা রকম সাংসারিক সুবিধার যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এরা করে চলেছে। এর মধ্যে একটা দর্শনতত্ত্ব আছে। কারণ এই আবিষ্কারগুলি যাতে সর্বসাধারণের কিনবার ক্ষমতার মধ্যে আসে সেজন্য ভূরি ভূরি উৎপাদন, কিস্তিবন্দিতে কেনা প্রভৃতি নানা বন্দোবস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের সুবিধা শুধু ধনী বা উপরতলার বাসিন্দার জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিধাতার দান আলোবাতাসের মত সকলেরই তাতে অধিকার আছে। সে অধিকার যাতে সকলের আয়ত্তের মধ্যে এসে পৌছাতে পারে সেদিকে সমাজব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি আর রাষ্ট্রনিয়ম সকলেরই সমান দৃষ্টি।

আজকের ইয়োরোপে যাকে হোম বলে সেই একান্ত নিজস্ব নিভৃত কুলায়ে নূতন করে নিবিড়তা এনে দিচ্ছে বিজ্ঞানের এমনি একটি দান, টেলিভিশন। সরকার তার উপর অস্বাভাবিক করভার চাপিয়ে দুর্মূল্য করে রাখে নি। ব্যবসায়ী এর চাহিদা বুঝে কালোবাজারে দাম বাড়ায় নি। বংশধরদের ভবিষ্যতে পৈতৃক সম্পত্তি আলস্যে উপভোগের সুযোগ দেবার জন্য গৃহী নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে বঞ্চিত করে রাখে নি। ইংলণ্ডের দীনতম কুটীরগুলিরও মাথায় উপর শোভা পাচ্ছে টেলিভিশনের আকাশী। ঘরের মধ্যে সবাই মিলে অন্তরঙ্গভাবে অবসর যাপন করছে। কন্টিনেন্টের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এমনিভাবে এই যন্ত্র চালু হচ্ছে।

প্রথম যখন রেডিও চালু হয়েছিল তখনো ঘরে ঘরে এমনি আনন্দের উপকরণ এসে গিয়েছিল। আজ তার মাদকতা নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা আছে। টেলিভিশনে এমন আরো একটি উপকরণ পাওয়া গেল বলে মনে মনে খুশী হলাম।

জানি যে নিত্য অস্বাস্থ্য আর অভাবের মধ্যে প্রতিপালিত এশিয়াবাসীর পক্ষে ভুল ভাষ্য করে শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে বলা খুব সহজ যে এই বিলাসের নেই শেষ, এই তৃষ্ণায় নেই তৃপ্তি। আগুনে আহুতি দিয়ে দিয়ে সুতই যাবে জুলিয়ে। তাতে আবাহন হবে না কোন দেবতার, কারণ পূজার মন্ত্র এতে নেই।

একদিন পরাধীন ভারতের শিক্ষার্থী ছাত্র নিজের অক্ষমতার সাফাই পেয়ে দার্শনিকের মত ভাবতে পারত যে সভ্যতার অর্থ এই নয় যে শুধু অভাব সৃষ্টি ও তার মোচনের পথ আবিষ্কার করতে হবে। তৃষ্ণা শুধু জীর্ণই করে, অতএব তৃষ্ণা ত্যাগ কর। সুখসুবিধার এই সীমাহীন সাধনায় শান্তি নেই, শ্রেয়সের আশ্বাস নেই।

দেশ থেকে একজন হিতৈষী বন্ধু লিখলেন যে যন্ত্রদানবের বহুবিস্তৃত বাহুই ইয়োরোপের সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছড়ানো আছে। ওরা মানুষকে যন্ত্রের উপর নির্ভরপরায়ণ করে তুলছে। কিন্তু হায়, তিনি ভেবে দেখেন নি যে বাসন ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে রুক্ষ হয়ে ওঠার বদলে প্রিয়ার পদ্মহস্তখানি যদি হাত-ধরাধরি বনভ্রমণে অবসর যাপনে কোমল স্পর্শ এনে দেয় সেটাই দুজনেরই কামনার ধন। সকাল থেকে সম্মার্জনী নিয়ে ব্যস্ত না থেকে তিনি বিদ্যুতের বলে সব পরিচ্ছন্ন করে নিতে পারলে তাঁর চোখে যে বিদ্যুৎ খেলবার আশা আছে তার উৎস অন্য কোথাও। নতুন উনান তৈরী হচ্ছে যার চেহারা হবে ঘরের কোনার সুন্দর রেডিও যন্ত্রটির মত, কিন্তু যার তাপ শুধু খাদ্যবস্তুকে তৈরী করবে, কিন্তু রান্নার পাত্র ধরলে ছ্যাঁকা লাগবে না।

কর্তাকে আর রোজ ভোরে উঠে নিজের হাতে পোশাকটি ইস্ত্রী করতে হবে না। এমন সব নাইলন আর টেরেলিন প্রভৃতি কাপড় তৈরী হচ্ছে যাতে তিনি আরো একটু সময় সবার সঙ্গে কাটাতে পারবেন। তিনি গোগ্রাসে যা হোক কিছু গিলে দৌড়ে অফিসে চলে যাচ্ছেন আর গৃহিণীর মেজাজ কড়াই মাজতে মাজতে চড়ে গেল—এ-হেন শোচনীয় মানসিক ব্যর্থতা ইয়োরোপে কেউ চিন্তা করতে চায় না।

পূর্ণতর জীবনে অংশ নেবার অবসর দিতে হবে সকলকেই। তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে পরিচ্ছন্ন দিগন্তে।

আমি নিজে আর আমার দেশও যে কত বদলিয়ে গিয়েছে। সেদিন ইয়োরোপ ছিল সাংসারিক সাফল্য পাবার জন্য একমাত্র সোনার শীলমোহর, অন্তত একটা স্বপ্নময় তীর্থ, বিস্ময়ের অমরাবতী। আর ভারত ছিল শুধু ইণ্ডিয়া। আজ আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক, সে হিসাবে সে দেশের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে আমার দায়িত্ব কতখানি। আজ ইয়োরোপের মনীষা ও মানবতা দুটিকেই ভারতের জন্য দাবি ও আহরণ করবার বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়েছে।

মানুষের সেবা যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তা হলে এই মানবিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও নিশ্চয়ই একটা অধ্যাত্মবাদ আছে। আছে সহস্র বন্ধনমাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ। আছে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার মধ্যেও নরনারায়ণের উপাসনা। এই বা কম অধ্যাত্মবাদ হল কিসে?

একজন ভারতীয় বন্ধু বাধা দিলেন। প্রতিবাদ করে বললেন যে, পশ্চিমের এই মোহিনী মায়াই প্রাচ্যের সর্বনাশ করবে। ভোগবাদী সভ্যতার প্রতিযোগিতায় নেমে প্রাচ্য শুধু যে তার সত্তাকে হারাবে—তা নয়, আত্মাকেও বিস্মৃত হবে। শুধু বিজ্ঞানের সুবিধার দিকটাই আমাদের নজরে পড়ছে, তার সংহারশক্তির কথা ভুলে যাচ্ছি।

কিন্তু এ তো শুধু বিজ্ঞানের দান নয়, এ যে সভ্যতার উপহার। এ মানুষকে দীনতা ও অসুন্দরতা থেকে মুক্তি দেবে। অভাব শুধু স্বভাব নষ্ট করে না, মানসেরও বিনাশ করে। এই বিনাশ ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে হয়েছে। অথচ ইয়োরোপে ব্যক্তির চেষ্টায়, রাষ্ট্রের সাহায্যে, সমাজব্যবস্থার ফলে সেই অভাব দূর হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বকবি লিখেছিলেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা।"

সভ্যতার নানা দানে ভূষিত সে ভাষা আজ ইয়োরোপের বিচিত্র বাণীতে রূপায়িত হয়েছে। শুধু শাকান্নের জন্য ক্রন্দনে ধ্বনিত হয়ে নেই।

বিজ্ঞানের সংহার মূর্তিকে অস্বীকার করি না। কিন্তু ইয়োরোপ শুধু বিজ্ঞানের সাধনা করে না, জ্ঞানেরও উপাসনা করে। শুধু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়েরও চর্চা করে। কাজেই কোন একটি শক্তিকে যদি আমরা কল্যাণের পথে নিয়োগ না করে ধ্বংসের দিকে ব্যবহার করি তা সমগ্র মানুষেরই পরাজয়, মনীষার নয়। সেই মানুষের পরীক্ষা শুরু হয়েছে পাশ্চাত্ত্যে। সেই পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াবার অধিকার গৌরবের কথা। তাতে জয়ী হয়ে প্রমাণ করতে হবে যে মানবই শিব।

ভৈরবের সংহারমূর্তিকে ভোলার সাধ্য কি? এখনো লণ্ডন শহরের পূর্ব পল্লীতে তার প্রচুর চিহ্ন রয়েছে। রয়েছে পশ্চিম প্রান্তের বিলাসকেন্দ্র পিকাডিলির ঠিক মাঝখানে। জার্মানির শহরে শহরে বিরাট ধ্বংসের উপর গড়ে উঠছে নতুন শহর, নতুন সৌধমালা। মাত্র দশ বছরে বহির্বাণিজ্যে

আবার সে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে। বার্লিনের টিয়ের গার্টেন ছিল ভুবনবিখ্যাত উপবন। মন ও মদিরা দুই-ই এখানে থাকত মধুর। সেই সুরাকুঞ্জের কাছে একটি পল্লী একেবারে নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বার্লিনের নগরপালরা ওই পল্লীটি গড়বার জন্য সমস্ত পৃথিবীর স্থাপত্যশিল্পীদের কাছ থেকে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং স্থপতিশ্রেষ্ঠ লে কর্বুসিয়ের হাতে সে ভার দিয়েছেন।*

ভিয়েনার প্রাণকেন্দ্র ছিল পৃথিবীবিখ্যাত অপেরা। সেটিকে সম্প্রতি নতুন করে গড়ে দ্বারোদ্ঘাটন করা হল। সেদিন এমনভাবে জাতীয় উৎসব করা হল যে সব ভিয়েনাবাসীই মনে মনে আশা করেছিল যে স্বর্গ থেকে ভিনাস মিনার্ভা জুনো এঁরা না নেমে আসুন অন্তত ইলংণ্ডের তরুণী রাণী বা জাপানের সূর্য-বংশধর সম্রাট নিজে থেকে সেই উৎসবে এসে যোগ দিলেই মানানসই হয়।

সংস্কার আর প্রয়োজন হলেই নতুন সৃষ্টির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে ইয়োরোপ। যুদ্ধে আহত পঙ্গু বিকলাঙ্গ কাউকেই ব্যর্থতা বেদনার মধ্যে জীবন কাটাতে দেওয়া পাপ হবে। তাদের জন্য বহু যন্ত্র, বহু চিকিৎসা ও সাজারির বিনামূল্যে ব্যবস্থা হয়েছে। দেশে যদি কেউ বেকার থাকে, অভুক্ত থাকে সে দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর এসে পড়বে। তার জন্য এমনকি সামান্য একটা শাসন-তন্ত্রের মধ্যে অক্ষমতা বা অসাধুতার জন্য মন্ত্রিসভার পতন হয়ে যাবে। অসহায় বৃদ্ধদের জন্য শুধু সরকারী খরচে হোম করে দিলেই হবে না, সেগুলিকে আনন্দময় করে রাখতে হবে। এমনকি যারা সুন্দর হবার মত ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মায় নি তাদেরও ইয়োরোপ ভুলে থাকবে না। কারণ, তা হলে যে এগিয়ে যাওয়ার ধারাই বাধা পাবে। তাই যে কাজ আমাদের দেশে মামুলী দর্জীগিরি নামে চলে আসছে তা-ই প্রতিভার স্পর্শে ওখানে উন্নত বস্ত্রশিল্পে পরিণত হয়েছে। যদি কেউ তার প্রেয়সীকে আরো একটু তন্বী দীর্ঘাঙ্গিনী দেখতে চায়, তাকে বিধাতার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করেই বসে থাকতে হবে না। সঙ্গতি থাকলে প্যারিসের ক্রিশ্চিয়ান ডিয়র তার জন্য কালো সাটিনের সান্ধ্য গাউনে কটিতটের ঠিক উপরে একটি ত্রিভঙ্গিম সাদা রেশমী বন্ধনী এঁটে দেবে।

* স্বাধীন ভারতে আমরাও এই স্থপতিশ্রেষ্ঠ লে কর্বুসিয়ের হাতে চণ্ডীগড় শহর পরিকল্পনার ভার দিয়েছি।

ব্যথা বা ব্যর্থতা, এমনকি যৌবন-বিলাস ইয়োরোপের ধাতস্থ নয়। তার সুখস্পৃহা তার যৌবনচর্চার মধ্যে যার পরিচয় পাই সে হচ্ছে অনন্ত জীবনসন্ধানী জরাহীন যযাতি।

এই সন্ধানের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা অনেক বেড়ে গেছে। জীবিকার প্রয়োজন আর জীবনের আহ্বান দুই-ই তাতে সহায়তা করেছে। হাতে সময় অনেক। হাতের কাছেই কাজ ও প্রচুর বেতন। এমন অবস্থায় কোন তরুণী কি শুধু বরণডালা সাজিয়ে ঘরে বসে দিন গুনবে? কোন যুবক পিতার আয়ের কল্যাণে উচ্চশিক্ষার অছিলায় শুধু কলেজে যাতায়াত করবে? কাজেই সকলেই কিছু-না-কিছু কাজ করছে। যে কাজ পাচ্ছে তাতে তৃপ্তি না হতে পারে, কিন্তু ব্যস্ত রাখতে হবে নিজেকে। সমাজ ও দেশকে কিছু কাজ দিতে হবে। তাদের প্রতি আমার কোন দান নেই সে যে বড় লজ্জার কথা হবে।

অন্যদিকে কাজের মাশুল হিসাবে স্ফূর্তির চর্চাও অফুরন্ত। থিয়েটার অপেরা কন্সার্টে এত ভিড়, মাঠে, সাগরপারে, পাহাড়িয়া অঞ্চলে এত আনাগোনা আগে কখনো ছিল না। পৃথিবীতে সব ললিতকলাই সমৃদ্ধি ও অবসরের দান। ইয়োরোপে আবার যে একটি বহুমুখী সৃষ্টির যুগ আসছে তার প্রথম চিহ্ন চারদিকে ফুটে উঠেছে। বিশ্বের দরবারে ইয়োরোপের এই মহা দায়িত্ব এসে পড়েছে আজ।

শুধু বহুমুখী নয়, বহুমুখাপেক্ষীও বটে। কারণ সব কিছুতেই গণতান্ত্রিকতার ছাপ আরো বেশি ফুটে উঠেছে। শিক্ষার প্রসার, সমাজব্যবস্থা ও করভার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে প্রতিভার বিকাশের জন্য আর বিশিষ্ট গণ্ডী বা পরিবারের সন্ধান করতে হবে না। ইংলণ্ডের নেতা হতে গেলে যেমন আর চার্চিল-বংশে জন্মের প্রয়োজন নেই, তেমনি ইণ্টেলেকচুয়াল বলে স্বীকৃত হতে গেলেও আর অক্সফোর্ড বা সরবনের ছাপ দেখাতে হবে না। নতুন মানুষের পরিচয় তার বংশে নয়, গোষ্ঠীতে নয়, এমনকি ক্লাব-রেস্তোরাঁতেও নয়। শেষের কথাটা খুব আশ্চর্য মনে হবে। মনে হবে যে মানুষের শ্রেণীর পরিচয় দিতে গেলে তার খাবার জায়গার কথা কোথা থেকে ওঠে। কিন্তু একটা উদাহরণ দিই। আদর্শ ও দর্শনবাদের জগৎ থেকে অনেক দূরে মাটির সংসারের একটি উদাহরণ।

মাটির সংসার কথাটির বিশেষ তাৎপর্য এখানে আছে।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন আমাকে, সেই দু যুগ আগেকার লাজুক ভারতীয় কল্পনাবিলাসীকে, নিমন্ত্রণ করলেন যে এত বছর আগে যে ইয়োরোপের বর্ণনা আমি করেছি তার তুলনায় আজকের ইয়োরোপকে কেমন দেখাছ তা বি. বি. সি.র মাধ্যমে ব্রিটিশ শ্রোতাকে জানাতে হবে। সেই উপলক্ষে তাঁরা বেতারে কথোপকথনের সময় বললেন যে যদিও আমি ইংলণ্ডের সঙ্গে বিমান চলাচল চুক্তির জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে এসেছি, তাঁরা আশা করছেন যে আমার দৃষ্টি শুধু আকাশের দিকেই আবদ্ধ থাকবে না। মাটির সংসারের কথাই তাঁরা শুনতে চান। উত্তরে বলেছিলাম যে চোখে যখন রঙীন চশমা আঁটা ছিল তখন আকাশের দিকে বহু তাকিয়েছি; কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার আলোতে মাটির দিকেই বার বার তাকাচ্ছি। কল্পনাবিলাসের চেয়ে বাস্তব সংসারের সমীক্ষাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাবতে কি পারত সেদিন আমার মত কোন অল্পবিত্ত কলেজের ছাত্র যে মোপাসাঁ ও এমিল জোলার মনীষার স্মৃতিবিজড়িত কাফে দ্য লা প্যা-তে বসে খেয়ে তার ছাত্রজীবনের সাধ মিটিয়ে আসতে পারবে? বলতে পারবে তার ধনী সহপাঠীকে যে সে-ও সেই বিখ্যাত ফরাসী বচনটির সার্থকতা যাচাই করে এসেছে এই কাফেতে? বচনটি হচ্ছে এই যে কাফে দ্য লা প্যা-তে খানিকটা সময় কাটিয়ে এসো; তা হলেই পৃথিবীতে দর্শনীয় যারা তাদের সবাইকে দেখতে পাবে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে ফ্রান্সের পতনের সময় একটি সন্ধ্যায় কাফের সামনে রাস্তার উপর ছড়ানো চেয়ারে বসে একজন প্রবীণ অভিজাত শ্যাম্পেনের আবেশে বিভোর ছিলেন। একজন প্রলেটারিয়াট হঠাৎ রাস্তায় থমকিয়ে দাঁড়াল। ঘুষি পাকিয়ে মুখে বিশ্বের ঘৃণা ফুটিয়ে বলল,—'ওই তুমি, তোমাকে ১৮৪৮ সনের বিপ্লবে আমরা খতম করতে পারি নি; আচ্ছা এর পরের বিপ্লবে তোমায় ভুলব না।'

তবু ছিয়াশি বছর ধরে এই কাফে তার অগ্নিমূল্যের ধ্বজা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। জার্মান দখলের সময় হিটলারের অনুচররা একে জার্মান সামন্তদের ক্লাবে পরিণত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। যুদ্ধবিজয়ী মার্কিন বাহিনী একে মার্কিন সরকারী কাজের জন্য ভাড়া করে নিতে চায়। কিন্তু মার্কিন সেনাপতিদের মধ্যেই একজন মাটিতে পা ঠুকে বাধা দেন,— কাফে দ্য লা প্যা জবরদখল করে নিতে চাও? তার চেয়ে নোতর্‌দাম গির্জাকেও জবরদখল করে নাও না কেন?

সেই কাফেতে আজ ভূমধ্যসাগরের শৌখিন মাছ 'রাসকাসে' দিয়ে তৈরী মিলিয়নেয়ারের ভোগ্য ব্যুইলাব্যা স্থ মেরিয়াসের বদলে পনীরের বড়া আর কাঁচা সব্জি টাকা দু-তিনের মধ্যে খেয়ে তরুণেরা তাদের স্বপ্ন সফল করে আসতে পারে। অভিজাততম সীমিত গণ্ডীপন্থী কাফের কর্তৃপক্ষ আর আপনাকে আমাকে উপেক্ষা করতে পারবে না।

ইয়োরোপের পূর্বপ্রান্তে জনতাকে স্বীকার করবার জন্য বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে রোদন ও ভাঙনের মধ্যে যে পরিবর্তন এল সেই একই স্বীকার আসছে পশ্চিম প্রান্তেও। কিন্তু অহরহ অদৃশ্য অঘোষিত পরিবর্তনের রূপে। মানুষের বাঁচবার, হাসবার এগিয়ে যাবার অধিকারের সীমানা আর খণ্ডিত সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না।

দু যুগ আগে শকুন্তলা যদি ইয়োরোপের মানস তপোবনে বিহার করতে আসতেন বসন্তকালে তিনি যে গীতিনাট্য দেখতেন তার নাম হত ব্লসম টাইম অর্থাৎ মুকুলের ঋতু। তারপরে তিনি এতদিন সংসারের স্পর্শে এসেছেন। কখনো রূপ, কখনো রূঢ়তা তাঁর যাত্রাপথে আনন্দবেদনা এনে দিয়েছে। সুখ-দুঃখের মধ্যে মানুষের সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয় ঘটেছে। তাই আজকের ইয়োরোপের সাজানো বাগানে তিনি যে নৃত্যগীতবহুল নাটক দেখবেন তার নাম স্যালাড ডেজ, কাঁচা সব্জির দিন। বসন্তের দোলা যৌবনের প্রসাদ আছে দুইয়েতেই। কিন্তু মানবতার স্পর্শে জনতার পথে এসে দাঁড়িয়েছে নবীন ইয়োরোপ। তার রঙ বদলাচ্ছে, তার ঢঙ বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে তার মুখশ্রী। কিন্তু প্রাণের মধ্যে সে সেই চিরকালের ইয়োরোপা।

॥ ইয়োরোপা সম্বন্ধে ॥

"লেখকের আছে দেখবার চোখ, জানবার উৎসাহ, যাচিয়ে নেবার বুদ্ধি আর সবার উপর সেই দুর্লভ চিত্ত যা শুধু জিজ্ঞাসু নয়, যা গ্রহণীয় জিনিস শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে জানে।·· ইয়োরোপের প্রাণের স্পন্দন তিনি আপন প্রাণের ভিতরে পেয়েছেন।"

—অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে শ্রীসোমনাথ মৈত্র

"—কখনো বা বনি প্রিন্স চার্লি এবং সুন্দরী কুইন মেরী তাদের অপরূপত্বে চমক লাগিয়ে চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে। এবং সেই সংস্তের মধ্যে অনুভব করি ইয়োরোপের চিত্তের এবং আত্মাব সানন্দ স্পন্দন।"

—প্রবাসীতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

" পুথি ছাড়াও পথে বিচরণ করেছেন এবং ইয়োরোপকে তিনি শুধু পথিকের দৃষ্টিতে না দেখে প্রেমিকেব দৃষ্টিতে দেখেছেন।·· শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টির পর্যায়ে হয়েছে।"

যুগান্তরে 'যাযাবর'

"ইয়োরোপকে নূতন করিয়া দেখিলাম দুর্লভ মনীষা ও চিন্তাশীলতার পড়িয়াছে।"

ভারতবর্ষে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

"তুমি বুঝতে পেরেছ ওদের সুখ দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার প্রাণের কথাটি।· ইয়োরোপা বইটি যদি শুধু একটুখানি উপাদেয় চমক পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হত তাহলে এটি কেবল belles letters জাতীয় লেখা ত। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য ওদেশেব সঙ্গে এদেশের ঘটকালি করা শুধু আনন্দের রসসত্রে নয়, জ্ঞানের যজ্ঞসত্রেও বটে।"

শারদীয় আনন্দবাজারে শ্রীদিলীপকুমার রায়

"লেখক সেই গোপন প্রাণের স্পন্দন গভীর অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে আমাদের পহার দিয়াছেন।"

—দেশ

"Here you find, through the author's magic eyes, Europe throbbing with life—ever restless in her inner conflicts and ever struggling for fresh forms of life."

Modern Review.

"……has seen Europe with sympathetic understanding, lyric ardour and imagination-laden eyes. Mr. Das writes beautiful Bengali with master's ease."

Amrita Bazar Patrika.

"An outstanding contribution to Bengali literature."

—Hindusthan Standard.

"ইয়োরোপার হিন্দী সংস্করণের ভূমিকায় রাষ্ট্রপতি ডকটর রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং এই বইটিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীগোবিন্দ দাস উচ্ছ্বসিতভাবে লিখেছেন যে কবিহৃদয়ের ভাবনায় ভরা ইয়োরোপা রাষ্ট্রভাষার প্রাসাদের শোভা অসামান্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোধা শ্রীসীতারাম চতুর্বেদী লিখেছেন যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদৃষ্টি নিয়ে লেখক ইয়োরোপকে দেখে তার প্রাণচঞ্চল আহ্বান এনেছেন। হিন্দী সাহিত্যজগৎ 'ইয়োরোপা'র ভাবের প্রসাদে রসসিক্ত হয়ে উঠবে।

ইংরেজী সংস্করণ সম্বন্ধে : Value of Europa Through Indian Eye as a human document is indisputable "(Times of India). We see the enternal undying mores and moorings of the people (Illustrated Weekly). "Has an unusual value with deep abiding passion for humanity"

(Sunday Standard, Madras